TUHINREKHA

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

তুহিনরেখা

একটি বিমূর্ত উপন্যাস

আমার এসথেটিক ইন্টেলিজেন্সের পথপ্রদর্শক

ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রাইটিং এর গুরু--

ভার্গব ও শীতাংশু কে

শ্রদ্ধায় , ভালোবাসায়-----

তুহিনরেখা

রাত বারোটার সময় মেলবোর্নের সামনে দিয়ে ওষুধ কিনে ফিরছিলো রাত্রি শিলোত্রি ।

গাঢ় নিশা , বড় বড় বিল্ডিং গুলি মনে হচ্ছে এক একটি ট্রান্সিস্টর ।

আলো জ্বলছে প্রতিটিতে । সুন্দর লাগছে । রেডিওর ওপরের ঢাকা খুলে ফেললে যেমন দেখায় , এগুলোকে ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে , রাত্রিতে , রাত্রির । চাঁদ ক্ষণস্থায়ী । ঘন ঘন-ঘন মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত । রাত্রির রাত্রি নিবাস একটি দুই কামরার বাড়িতে । একটু ঘিঞ্জি এলাকা । অ্যাফ্রিকান মানুষ বেশি । মাথায় অজস্র বেণী করা আবিবা কিংবা সদাহাস্যময় লোবো ।

টুল্লামেরিন ফ্রি ওয়ে দিয়ে না এসে ও অন্য রাস্তা ধরলো । যদিও রাত অনেক হয়ে গেছে তবুও ওর বাড়ি ফিরতে তেমন ইচ্ছে করছিলো না ।

একটি হাতে লেখা ডাইরির কতগুলি পাতা ওর মনকে গভীর ব্যাথায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো কদিন । আজ শরীরটাও তাই বুঝি সংগ্রামী হল । রাতে হঠাৎ জরুরি ওষুধের প্রয়োজন হয়ে পড়লো । মেলবোর্নে , ঘন নিশায় যে কয়েকটি মেডিসিন শপ খোলা থাকে তারই একটি হল ফার্মা গড । সেখানেই ও গিয়েছিলো । তা বেশ দূরে । আধ ঘন্টা , ওর বাসা থেকে ।

রাতের শহর মায়াময় । মধুর আবেশে চোখ বুজে আসে ।

গাড়ি চালাতে হচ্ছে তাই তো ও জেগে আছে । বাড়ি ফিরে হয়ত কিছু খাবে । স্যালাদ , ওমলেট আর পেঁপে সেদ্ধ । আজকে হালকা খাবে । সকালে আবার দেখা যাবে ।

এখন শরীর জুড়ে তুষারের ঢল । খুব বিষাদ , বিস্বাদ । জোলো সব ।

চলতে চলতে একসময় সব চলাই থেমে যায় , মানুষ স্তব্ধ হয় ।

চলমান চিত্রগুলি আকাশের তারা হয়ে যায় । কখনো কখনো ধূসর মেঘ ।

রাত্রির বাড়ি এসে গেলো । কাঠের বাড়ি , হলুদ রং । একপাশে এক চিকিৎসক থাকেন , অ্যাফ্রিকান , আকিনসিন নাম তার । অন্যদিকে একটি বাচ্চাদের ক্রেশ । এখন বন্ধ ।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো রাত্রি । ওষুধ পত্র জায়গা মতন রেখে দিলো । ব্যাগ টেবিলে রেখে জুতো জামা পরা অবস্থাতেই ও ডাইনিং টেবিলে বসলো । খাবার রাখাই ছিলো ।

পালং শাকের স্যালাদ যা কিনা কুমড়ো সেদ্ধ , পেঁয়াজ ও বাদাম দিয়ে তৈরি , ওমলেট করে নিলো একটি আর পেঁপে সেদ্ধ, আলাদা করে । আজকাল হালকা খাবারই বেশ লাগে ।

ওর পতিদেব অন্য শহরে আছেন । সপ্তাহান্তে বাড়ি আসেন । উনি মাইনে অর্থাৎ খনিতে কাজ করেন । সাহেব । ওর আগের পক্ষের দুই সন্তান হোস্টেলে আছে । প্রথমা স্ত্রী মৃতা । দ্বিতীয়া স্ত্রী রাত্রি শিলোত্রি টাইসন । স্বামী ডেরেক টাইসন ।

রাত্রি এদেশে , কাজের জন্যে এসেছিলো । ও কলেজে সাইকোলজি পড়ায় । তাছাড়া একজন পাবলিক স্পিকার । সপ্তাহে ও চারদিন কাজ করে । পঞ্চম দিন নিজের জন্যে সময় রাখে । শনিবার স্বামী আসেন । সোমবার অবধি থাকেন । দুপুরে ফিরে যান । তখন ও ক্লাস নিতে যায় । সন্ধ্যা অবধি ক্লাস নেয় সেদিন । ও মনে করে সাইকোলজি এমনই বিষয় যা ধরাবাঁধা নিয়মে কিংবা সময়ে পড়ানো যায়না । এই সাবজেক্ট মানুষকে নিয়ে । কাজেই ও হিউমান টাচ দেয় । শিক্ষাপ্রণালী তে । অনেক সময়ই ও রবিঠাকুরের মতন গাছের তলায় বসে পড়ায় । চাঁদভাসি কোনো কোনো সোমবার , সোম মানে চাঁদের সন্ধ্যায় বাগানে বসে ক্লাস নেয় । আলোচনা করে । ছাত্ররা ওকে পছন্দ করে । র‍্যাট্রি ম্যাম ওদের ফ্রেন্ড ।

র‍্যাট্রি কিংবা রা -কে ডেরেক টাইসনও খুব ভালোবাসেন। ওকে সবাই ভালোবাসে। ওর একটি কমনীয়তা ও স্নিগ্ধ স্বভাব আছে। কথা বলে ধীরে, গভীর ভাবে।

ওর ব্যবহারে আলো আছে, আগুন নেই। আগ্নেয়গিরি নেই। ও মুক্তমনা। বন্ধু বৎসল।

তাই বুঝি নিষিদ্ধ ডাইরি ওর হাতে এসেও পড়ে ছিলো বহুদিন। ও পড়তে চায়নি।

কিন্তু বান্ধবীর বিশেষ অনুরোধে পড়তে বাধ্য হল। ওর বান্ধবী, কলেজের প্রিয় বান্ধবী ডুলুং রায় ওকে লিখেছিলো, শেষ ইমেল।

❖ আমার ডাইরি পড়লেই আমাকে জানতে পারবি। আমি খুব লাজুক। সবকিছু মুখ ফুটে বলার সাহস নেই তুই তো জানিস।

হ্যাঁ রাত্রি জানে। পেশায় শেরপা হলেও স্বভাব লাজুক। ওদের ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক মেয়ে ছিলো এই ডুলুং। যার জন্মের সময় ওর বা মামা ছিলেন মেদিনীপুরে, ডুলুং নদীর কিনারায়। ওর বাবা ও মা ওখানে বেড়াতে যান। হঠাৎ -ই লেবার পেন ওঠায় এক আদিবাসীর ঘরে ওর জন্ম হয়।। ও অনেক আগেই ভূমিষ্ঠ হয়। ফরসেপ ডেলিভারি।
কঞ্চি কেটে, মাথায় কাপড় গুঁজে -তাই দিয়ে ওকে নিয়ে আসা হয় ধরাতলে।

ডুলুং- এর ডাইরি :একটি মোটা নীল বই । লাইন গুলো চওড়া , মেটে রং এর ।
এক একটা লাইন গ্যাপ দিয়ে লেখা , গোটা গোটা অক্ষরে ।
কালো কালো অক্ষর থেকে যেন চুঁইয়ে পড়ছে গোটা জীবন । এক অসামান্যার ।
ডুলুং এক কুয়াশা , মিথ ।
ডুলুং নদীর জলে ডাকাতেরা নাকি মানুষের মাথা নরবলি দেবার পরে ভাসিয়ে দিতো । কারণ ঐ এলাকার জমিদার ছিলো ডাকাতে কালীর উপাসক ।
ডুলুং নদী অবশ্যই মিথ । নাকি মিথকথন ?

ডাইরিটি এক নাগাড়ে পড়া যায়না । কারণ প্রতিটি ছত্র এক একটি আলেখ্য । সমঝে বুঝে পড়তে হয় । এ কোনো সাধারণ মেয়ের জীবনী তো নয় !
দিনের মুড বুঝে ডাইরির পাতা ওল্টাতে হয় ।

প্রথম পাতায় যে নামটি চকচক করে তাহল : উপসংহার ।

ফ্ল্যাশব্যাকে ওর জীবনী ।

ডুলুং এক বাঙালী মেয়ে , ভীতু মেয়ে যে পরে শেরপা হতে পেরেছিলো ।

হিমালয়ের শেরপা নয় , দক্ষিণ গোলার্ধের এক অচেনা দেশ , বরফ মাখা প্রান্তরের শেরপা । প্রেরণা ও শিক্ষা কিছু নেপালি শেরপার কাছে । যারা সুদূর নেপাল থেকে এসে ঐদেশে বাসা বেঁধেছে । নিয়মিত পাহাড়ে চড়ে , অভিযাত্রী সমেত ।

ওরা তো জাত পাহাড়ি , তাই ডুলুং ওদের মতন হতে চেয়েছিলো । কিন্তু ভীতু বাঙালী মেয়ে দেখলো যে ওর শারীরিক ক্ষমতা বেশ কম , শেরপাদের তুলনা । তবুও ও ভেঙে না পড়ে হালকা কাজ নিলো । অভিযাত্রীদের গাইড করা , হিমবাহের ওপরে রন্ধন , পথ চেনানো ইত্যাদি করতো । কেন ?

কারণ ও বরফমাতাল । বরফ ওর ভুবন । একদিন বরফ না দেখলে কলকাতার মেয়ের ভালোলাগতো না । মহারাষ্ট্রে ও প্রায়ই চলে যেতো পাহাড়ে । মহাবালেশ্বর কিংবা লোনাভালা । কিন্তু সেখানে বরফ নেই ।

মহারাষ্ট্রে পড়তে আসাকে ও বলতো : এসকেপ ।

বাড়ি থেকে মুক্তি । পরিবার থেকে মুক্তি ।

খরচ দেন ছোটকা ও লালকা । দুই কাকা । বাবা ও মা নন ।

ও লিখেছে একটা চ্যাপটার নাম - চন্দ্রমুখী কলোনি, কলকাতা ।

ঐ এলাকায় প্রবেশের মুখে একটি বিরাট গেট । সেখানে বড় বড় করে লেখা চন্দ্রমুখী কলোনি । সাদা গেট , কালো লেখা , কালো বর্ডার ।

ডুলুং বলছে অক্ষরে অক্ষরে যে -ও কবিতা লিখতে অক্ষম । কোনো একটি পত্রিকায় একদা পড়া , বেহাগ নামক এক অখ্যাত

কবির লেখা এই কবিতাটি যেন ওকে টেনে নিয়ে যেতো ঐ নিবাসে ।

--চাঁদ ডুংরি লালমাটি আলোছায়ায় সিনান

নগর জীবনে বড্ড যেন হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ ।

ময়না- টিয়া , টুসু ভাদু শাল পিয়ালের বন

উড়ু উড়ু মন আমার

উড়ু উড়ু মন

কোথায় যেন যেতে চায় ভরা এই শ্রাবণ --

পায়ে শেকল , গায়ে চাদর করি হায় হায়

মন তবু এই শ্রাবণে উড়ে যেতে চায় !

জোছনাবুড়ো ডাকে মোরে তাই দুহাত তুলে

চাঁদের দেশ থেকে

দূষণ , ভূষণ , গলদঘর্ম , যুদ্ধবন্দীর বেশে

হাঁসফাঁস করে মরি ধরণীতে তবু-

সে যে উড়ে যেতে চায়

মোম জোছনা , দক্ষিণ রায় , শালডুংরীর গায়ে ।

কলোনি বললেই মনে হয় সমষ্টিগত বসবাসের কথা । ব্যাকটেরিয়া , মানুষ বা পশুপাখি যাই হোক না কেন । তবে আমরা সাধারণত কলোনি বলতে বুঝি পূর্ববঙ্গ থেকে বিতারিত হয়ে আসা মানুষজনের বসতির কথা । সার বাঁধা ঘর ।

কখনো টালি দেওয়া , কোথাও বা পাকা , কোথাও মাটির , ব্যাড়ার । এই তো কলোনি । কেউ একটু পড়াশোনা করে ভালো উপার্জনে সক্ষম । কেউ দরিদ্র । কেউ রুচিশীল । কেউ অতি সাধারণ । ভদ্দরনোকের ভাষায় ছোটনোক ।

আমি কৈশোর থেকে চন্দ্রমুখী কলোনিতে যাতায়াত করি । মহলের মেয়ে যেতো কলোনিতে । হা ঘরেদের সাথে ওঠাবসা । ওরাও মানুষ সেসব ভাবতাম ।

খুব কাছ থেকে দেখেছি রিনি , শুক্লা , দেবীদের । বীণা তো আগুনে পুড়ে মারা গেলো । টানা ২০ দিন যমে মানুষে টানাটানি । শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়েছে । পণ নিয়ে গোলমাল । ওর বাবা ছিলেন স্যাকরা । ছোট দোকান । যথেষ্ট টাকা দিতে পারেন নি ।

যতীন কিডনি খারাপ হওয়াতে বাঁদরের কিডনি লাগালো । সে এক মজা । মানুষের পেটে নাকি বাঁদরের কিডনি ! সবাই ওকে দেখতে আসতো । ওর খান্ডারনি মা শেষকালে আট আনা করে নিতো ।

রাখাল সাহার বৌ মরলো অকালে, ক্যানসারে । ওর পাশের বাড়িতে থাকতো এক যাদবপুরের ছাত্র । সে তখন বিদেশে গিয়েছিলো । পড়ার ব্যাপারে । গবেষণা করতো । নিয়ে এসেছিলো একটি কালচার্ড পার্লের হার । ভদ্রমহিলা পরতে পারেন নি । ছেলেটি যেদিন ল্যান্ড করে সেদিনই ভোরে উনি মারা যান । যতদূর মনে পড়ে ওর নাম ছিলো মাধুরীলতা । উনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন । খেতে দিতেন - খেয়ে নিতাম তবে ভাত ফাত বেশি নয় ঐ মুড়ি গুড় , মোয়া নাড়ু এগুলো বেশি খেতাম ।

আদর করে ডেকে কেই বা খাওয়ায় ?

কষা কষা করে ডিমের ডালনা , পাকা রুই , লাউয়ের খোসা ভাজা , কচুর শাক , শুঁটকি মাছ !

এখানে এক যাদবপুরে পড়া ছেলেকে আমার ভালোলেগেছিলো । ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তো । ভালো ছাত্র ছিলো । প্রখর জীবন বোধ । খুব পরিণত মন ।

দেখতে অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের মতন । আর ও বডি বিল্ডিং করতো সেই কালেই ।

লোমশ বুক । আজকালকার বলিউডি হিরোদের মতন ।

আমি ওকে একদিন গিয়ে বলি : আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই । (স্ট্রেট ড্রাইভ)

ও বলে : তুমি বড়লোকের মেয়ে । মহল , গাড়ি , সোস্যাল স্টেটাস , বিজ্ঞানী বাবা-মা , উচ্চবর্ণ । আমি গরীব , বাবা তফশিলি উন্নয়ন বিভাগে কেরানী , জাতিতে ও বি সি ।

আমি বলি : তোমার জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে পারি ।

আমার বয়স তখন মাত্র সতেরো । আমার রং চাপা। চোখ খুব বড় ও এক্সপ্রেসিভ বলে ও আমার নাম দিলো হরিণ চোখো মেয়ে । কোনো কবি বা লেখকের লেখা আছে বোধ হয় এই নিয়ে ।

আমার হাই প্রোফাইল বাপ মায়ের আমার জন্যে সময় ছিলো না , আত্মরতিতে ভোগা আঁতেল এক মা যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত । সন্তানের জন্যে সময় নেই । কেরিয়ারই সব ।

আমি বিহঙ্গ হতে চাইতাম । খোলা নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে ইচ্ছুক ছিলাম ।

ছেলেটি কলোনির কিন্তু ওর রুচিজ্ঞান বোধ আভিজাত্য প্রশংসনীয় ।

আমি ওকে বিয়ে করতে ডেসপারেট ছিলাম । ঐ বয়সেই । মাত্র সতেরো । কিন্তু ও আমার বয়ফ্রেন্ড ছিলো না । ওকে দেখতাম । দেখার জন্য কলোনিতে যেতাম ।

খুব সুন্দর কথা বলতো । রবীন্দ্রনাথের গান শোনাতো ভরাট গলায় । ওর দিদি নজরুল গীতি গাইতো ।

ঐ বয়সে বিয়ের কথায় আমার বন্ধুরা বলতো তুই পাগল হয়ে গেছিস । আমি ওকে বিয়ের কথা বলাতে ও হাসতো । বলতো : জীবন খুব কঠিন । বাস্তব খুব কঠিন । আগে বড় হও ।

তারপর তো বিয়ে ।

আমি বললাম : তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না ।

ও জানতে চাইলো -কেন ? আমি তো তোমার বয়ফ্রেন্ড নই । কত ভালো ভালো ছেলে আছে দুনিয়ায় ।

বাঘা বাঘা ছেলেরা নাকি আমার পরিবার ও বাবা মাকে দেখেই আমাকে নিয়ে যাবে !

আমার একটুও ভালোলাগছিলো না ওর কথাগুলো ।

ও বললো : আজ যা ভাবছো কয়েক বছর পরে দেখবে সব ফাঁকা । তোমার লাইফ স্টাইল আর আমাদের তো আলাদা তাই তখন তুমি বোর হয়ে যাবে । ফ্রাস্ট্রেশান হবে ।

ছেলেটি ইচ্ছে করলেই আমাকে ফাঁসাতে পারতো । কিন্তু করেনি । আমার বাবার এক কানাকড়ি সম্পত্তি পেলেও ও বর্তে যেতো কিন্তু কলোনির ছোটলোক তা করেনি । ভদ্দরনোকের মেয়েকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলো । ভদ্দরনোকের মেয়ে সর্বস্ব নিয়ে হাজির ছিলো সেদিন ওর দুয়ারে । কচি মন , নির্মল হৃদয় আর বাবার অঢেল টাকা ।

আমাদের বাড়িকে বলা হত জাহাজ বাড়ি । তবুও জাহাজে চড়ার লোভে নিজের অস্তিত্ব সংকটে যায়নি । ছেলেটি আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলো । একটি কিস ।

সিগারেট পোড়া কালো ঠোঁটের চুম্বন । মুখে নিকোটিনের সুবাস । হলদে আঙুল । হাস্কি ভয়েস । লোমশ বুকে চেপে ধরে --- সতেরো বছরের ভঙ্গুর আমি । থরথর করে কাঁপছি ।

কদম গাছের তলায় কলোনির ছেলে ও মহলের মেয়ে ।

ইট ওয়াজ আ প্যাশনেট কিস ।

বলেছিলো : এটাই শুধু মনে রেখো । জীবন সবকিছু দিতে জানে না । নিতে জানে অনেক বেশি ।

কতই বা বয়স তার তখন ? মাত্র ২১ ।

কলোনির ছেলে । ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে যাদবপুরে । ইলেকট্রিক্যাল ।

ও কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলো না । খুব ইন্টেলেকচুয়াল ছিলো । মিতভাষী । গভীর চোখ । প্রশান্ত মহাসাগরের মতন । বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা । কাহলিল জিব্রান ও জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা ঐ আমাকে প্রথম বলে । আমি তখন নাস্তিক ছিলাম । আই ওয়াজ আ ড্যাম এথিস্ট ।

কলোনির মানুষ ওকে মনে হয় না ।

ওদের পাশের বাড়ি থাকতেন আনন্দ স্যার । একটি স্কুলে পড়াতেন । সিন্থেসাইজার বাজাতেন -দারুণ সুর । নানান ফাংশানে বাজাতেন ।

পরে গডফাদারের সুরটা শুনেছি । সেটা অনেক পরে । এক মহলের মেয়েকে উনি বিয়ে করেন যিনি বাংলায় ডক্টরেট ।

আমাকে বলেন : আমি এখন মহলে থাকি কিন্তু জীবন খুঁজে পাইনা । বড় নিরস সব কিছু ওখানে রে -- আমাদের দেশে কত মানুষ অভুক্ত থাকেন আর এরা থালায় অহেতুক রাশি রাশি খাবার নিয়ে তারপরে বলে : পেট ভরে গেছে । আর খাবার চলে যায় ডাস্টবিনে । ওখানে বসে কোনো ভিখারী সেই খাবার তুলে খায় । অথচ আগে যদি বলি : ওকে এক মুঠো ভাত দাও তখন ওরা আমার সাথে বচসা করে । এদের মহলে জীবন আর্টিফিয়াল । এরা প্লাস্টিকের মানুষ রে!

দেখেছিলাম আর রাধাদিকে । একনিষ্ঠ কর্মী । একটি শিশু প্রতিষ্ঠানকে একা হাতে দাঁড় করান । তখন ওখানে ক্রেশের কনসেপ্ট ছিলো না । এক ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন জাহাজের কাপ্তান । উনি রিটায়ার করে ওদিকে বাসা বাঁধেন । কাছেই কলোনি । ক্রেশ খুলে একটি আয়া নেন । রাধা দি সেই আয়া । পরে কর্ম নিষ্ঠার জন্যে পদন্নতি হয় । হন দিদিমণি । পড়তে জানতেন ।

পড়েছেন ক্লাস নাইন অবধি । খুব সুন্দর কথা বলতেন । আমাকে ঘুগনি খাওয়াতেন । ফুচকা খাওয়াতেন , আলু কাবলি ।

টাকা নিতেন না । বলতেন : বাচ্চা মেয়ে টাকা দিবি কি রে ?

কলোনিতে বিয়ে করে এসেছিলো টুম্পা সেনগুপ্ত । ওর বাবা ছিলেন পুলিশে ।

একটি ছেলেকে ও ভালোবাসে । ছেলেটি খুব সুবিধের নয় তবুও ও তাকে বিয়ে করে । পরে ছেলেটি শুধরে যায় । মেরিনে খালাসীর চাকরি নেয় । দূর্ভাগ্যবশতঃ বিদেশে গিয়ে একটি দূর্ঘটনায় ওর হাত কাটা পরে । অনেকদিন ওর কোনো খবর ওর বাড়ির লোক পায়নি । শেষে একদিন জাহাজে করে ফেরে । একটি হাত ওর চলে যায় । পরে ও কলোনিতে হোসিয়ারির ব্যবসা শুরু করে জীবন যাপন করে । জাহাজ কোম্পানি কোনো সাহায্য করেনি বিশেষ । রাশিয়ায় অনেকদিন ফেলে রেখেছিলো । আন কেয়ার্ড ।

বাংলাদেশ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁদের সবাই সুশিক্ষিত , অভিজাত না হলেও অনেকেই তাই । তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলোনিতে উঠতে বাধ্য হয়েছেন । কাজেই তাঁদের আচার ব্যবহারে রুচির ছাপ থাকেই ।

চিনু পিসি স্বামীকে হারান ওপাড় থেকে আসবার সময় । এখানে এসে এক ইস্কুল মাস্টারের সাথে ঘর বাঁধেন । অনেক দিন একা ছিলেন । পরে সবাই মিলে ধরে বেঁধে বিয়ে দেন ঐ মাস্টারের সাথে । কতদিন আর এইভাবে একা থাকবেন একলা মহিলা ?

সেলাই করতেন । সেলাই স্কুল চালাতেন ।

রত্নমালা সাহা ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার । উনি এক প্রেমিকের সাথে থাকতেন । নাম অমল । সেও ডাক্তার । তবে কবিরাজ । তার কেউ ছিলোনা । পরে ইউরোপের দিকে চলে যান । ওখানেই বিয়ে করেন এক মেম মেয়েকে ।

যখন মালাদির সাথে ছিলেন - হাঁপানির টানে কষ্ট পেতেন । বমন করে সব ভাসাতেন । মালা দি হাসপাতাল ও চেম্বার কামাই করে সেগুলি সামলাতেন । কলকাতার হোমিওপ্যাথি হাসপাতালে উনি বসতেন । তারপর একদিন ঐ দাদা বিলেতে চলে যান । বিলেৎ মানে ইংল্যান্ড ও ইউরোপ । বিদেশ মানে অন্যসব দেশ । ছোটবেলা থেকে আমরা এরকমই জানি ।

এই দাদা কোনো বিশেষ স্কলারশিপ পেয়ে ওখানে যান । মালাদি যাননি । ওর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় । উনি আর বিয়ে করেন নি ।

জবার দাদা উদয়ের ছিলো মুদির দোকান । সে হতে চেয়েছিলো স্থপতি । হতে পারেনি অর্থের অভাবে । মুখে মুখে নানান জিনিস শোনাতো আমাকে । প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও আজিকার মধ্যে কি ফারাক । তখন কি কি সৌন্দর্য্য দেখা যেতো । এখন কতটা ভেজাল এসেছে ডিজাইনে । আবার কতটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে সুন্দরতর হয়েছে গঠন ।

স্থপতির কাজে দর্শনের ভূমিকা কী । একজন ভালো স্থপতি হতে গেলে তাঁর মধ্যে কী কী ধরণের গুণের সাথে সাথে ফিলোসফির পরশ লাগে । এইসব । মুগ্ধ হয়ে যেতাম । ছেলেটি কলোনিতে থাকে । অবসরে লাইব্রেরি থেকে বই এনে এইসব পড়ে ; বসে বসে । যে স্থপতি দর্শন বোঝেনা সে গোদা আর্কিটেক্ট , ও-ই বলতো ।

বিজন ছবি আঁকতো । গাঁজা বিক্রি করতো । টুকটাক ।বাচ্চা ছেলে । ছবিগুলি চমৎকার ।

আমাকে ধরেছিলো --দিদি আমারে আঁকা শিকাইবা ? আমি তুমারে পইসা দিতে পারুম না ।

আমি বলি : ওরে বোকা আমি কি নিজেই পারি ? পারলে তো শেখাবো !

ওখানে অনেক কাঠগোলাপ ও কামিনী ফুলের গাছ ছিলো , আমাকে টানতো । আর সর্ষে ইলিশ । কচি মটর শাকের গন্ধ । উজ্জ্বলা উত্তরা উৎপলা বণিকদের বাড়ির রসুইঘর থেকে ।

খুব লোভ লাগতো । ইচ্ছে করতো কংসাবতীর চরায় রাতের আঁধারে বসে বসে এগুলি ভক্ষণ করি ! দূরে সার বাঁধা নৌকো । টিম টিম করে জ্বলছে আলো , সেখানে । হয়ত কোনো মাঝি নোঙর খুলে বসে আছে জীবনের পারাবারে । ভরাট গলায় ভেসে আসে গান , যা শুনে সব দু:খ ভুলে যাওয়া যায় ।

আজব কল্পনা , তাই না ?

শিখা একটি বাড়িতে বাচ্চাদের দেখা শোনা করতে যেতো । ওখানেই মালিকের নেক নজরে পড়ে যায় । মেধাবী বলে ওকে মহারাষ্ট্রে পড়ার ব্যাবস্থা করে দেন মালিক । ওখানে ফার্মাসি নিয়ে পড়ে ও এখন আমেরিকার হুস্টনে ।

ভদ্দরনোকের মেয়ে সুচেতার সাথে সম্বন্ধ হয়েছিলো কলোনির ছেলে বালুর । মেয়েটির বাড়ি থেকে দেয় নি - শুভ বিবাহ , কলোনি শুনে । কাগজ দেখে তো সেই বিয়ে হবার কথা ।

পরে বালু আমাদের এই বরফ রাজ্য, ডেলিয়া দেশে পাড়ি দেয় । এখন এখানে থাকে । আমার সাথে দেখা হয়েছে ।

ডাক্তার । সার্জেন । পড়ার খরচ দিয়েছে এক বড়লোক । যার বাড়ি ও টিউশুনি করতো । বদলে খেতে পেতো ।

বালুর দাদা তো ডাবলু বি সি এস পাশ করে সাব ডিভিশান জজ হয়েছিলেন ।

সামান্য আয় তবুও দেখেছি ওদের মধ্যেই কেউ কেউ ভিখারিকে প্রতি শনিবার ভোজ দেয় । নিজেদেরই অর্থ নেই তবুও দরিদ্র মানুষকে ধার দেয় ।

বলে : আমাদের পেট ভরলে , ওদেরও ভরা উচিৎ ।

ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আজও আছে । ওরা রোবট হয়ে যায়নি আমাদের মতন । আমাদের তো সবকিছুই চলে পয়সার মাপে । আভিজাত্য , অর্থ , স্টেটাস আমাদের জীবনের মূর্চ্ছনা ।

পুজোতে ওখানে খুব আনন্দ হত । কালীপুজোতে বিশাল উৎসব ।

সারারাত ধরে পুজো , বাজি । তারপরে গোগ্রাসে খাওয়া । খিচুরি , পাপড় , লাবড়া , চাটনি । ওহ্, দারুণ ! মিনুমাসি খিচুরি বানাতেন । দুর্গা নবমীতে হত পাঁঠা । সেটা রান্না করতো বুড়ো - অনিকেত পাল । রথের সময় এই বুড়োই আবার সাজতো কৃষ্ণ । রথ টানতো সবাই । ও তার সাথে সাথে যেতো । এখানে থাকতেন একটি যাত্রা দলের কাপেল । ওরা রাম ও সীতা সাজতো । রথের দিনে ওদেরও দেখা যেতো কিছু বিশেষ চরিত্র সেজে বার হতে । হোলি মহোৎসব । সেদিন রঙের খেলা । ভাসতো মিঠেল ভেলা ।

আমি খুব ইনভলব্ড হয়ে যেতাম ওখানে । ওদের মাঝে । খুঁজে পেতাম প্রাণের স্পন্দন , যা আকরিক ।

ওখানে বাঁশি বাজায় পদ্মনাভ । তোলে হিল্লোল । উচ্চাঙ্গের কবিতা সেই সুর ।

ওখানেও মানুষ আছে । এবং অনেকেই বেশ মহা মহা মানুষ ----

আমি জীবন খুঁজি সেখানে -যেখানে সহজে অভিজাত মানুষ ও গৃহী লোকেরা যাননা । আমি বিবাগী কন্যে ।

====

এরপরে ডুলুং একটি গল্প লিখেছে । একটাই গল্প জীবনে লিখেছে ।

কোনো নদীর ছায়ায় বসে , বুনোহাঁস আর অচেনা পাখির খেলা দেখতে দেখতে রচিত হয়েছে এই আজব গল্পখানি । নাম অ্যাপার্টমেন্ট ।

অ্যাপার্টমেন্ট ::

সোনালী ম্যাপেল গাছের ঝরা পাতা সরিয়ে জিঞ্জার লেমন টিতে চুমুক দিলো সুস্নাত । সামনে খোলা ছোট খবরের কাগজ । লোকাল কাগজ । হলদেটে । ঈষৎ দোমড়ানো ।

পুণের একটি অ্যাপার্টমেন্টের খবর -কাগজে এসেছে । বিরাট বাড়ি । নাম মহালক্ষ্মী ।

এত বড় বিল্ডিং হয়ত পুণেতে আর নেই । ৩০ তলার বিল্ডিং । ওখানে থাকতেন স্কুল শিক্ষিকা মালবী পুরকায়স্থ । বন্ধুরা তাকে ক্ষ্যাপাতো : হাফ কায়স্থ বলে ।

বলতো : উইকিপিডিয়াতে দেখলাম বাঙালী উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের পরে আসে পাল , দত্ত এরা । আদতে তা নয় । ঘোষ , বোস, মিত্র , গুহ (বাংলাদেশে) কুলীন কায়স্থ । তারপরে সেন , সিংহ , দাস, দে , দত্ত , কর , পালিত । তারপরের গুলো বাহাত্তুরে ঘরের কায়স্থ । পাল তো কুমোর ! ওরা আবার উচ্চবর্ণ হল কবে ? কিছু পাল অবশ্য নিজেদের কায়স্থ বলে ।

এই যেমন তোরা , কায়স্থই নোস তো হাফ আর ফুল ! কি রে কায়স্থ তো ? সত্যি ? তোরা কি কায়স্থদের থেকেও নিচু ??

মালবী হেসে বলতো : জাতপাত ভুলে মানুষ হিসেবে মেলামেশা করলে হয় না ?

সেই মালবী স্কুলের চাকরি ছেড়ে হঠাৎ বেপাত্তা । বন্ধুরা চিন্তিত ।

এক বন্ধু সুদূর ইউরোপ থেকে ওকে খুঁজতে এসেছেন পুণে । রূপালি নামক একটি রেস্তোরাঁ আছে সেখানে অসাধারণ ইডলি , উত্তাপাম এইসব পাওয়া যায় । এতই বিক্রি হয় যে মালিককে আরেকটি খুলতে হয়েছে । সেখানে আগেও খেয়েছে বন্ধুবর

সুস্নাত বোস । আজও খেলো । তবে স্বাদ আজ জোলো মনে হল । মনটাই যে ভালো নেই । মালবী হঠাৎ কোথায় গেলো ?

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাতে বেলা হয়ে যায় । ওয়াচম্যান একজনই । এত বড় অট্টালিকায় একজন ওয়াচম্যান বিরক্তি ধরায় । লিফটও একটাই ।

সুর একটা মিহি সুর ভেসে আসছে । বন্ধুর ঘরে যেতে চায় সুস্নাত । যদি ঘেঁটে ঘুঁটে কিছু বার করতে পারে ! কোনো ক্লু ! সন্ধানের রসিদ । অববাহিকায় নৌকোর দাঁড় খোঁজা !

প্রতিটি তলা ঘুরে দেখবে কারণ ও জানেনা কত তলায় মালবী থাকতো । এইবাড়ির ঠিকানা বদলায়নি তবে মালবী মাঝে ফ্ল্যাট বদলেছিলো । অন্য ফ্লাটে শিফ্ট করেছিলো । নম্বরটা জানায়নি ।

সুস্নাত আশাবাদী । সুরের উৎসস্থলের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ।

দেখে লাল কার্পেট মোড়া ঘরে এই তো দিব্যি মালবী বসে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে !

পাশে বীণা , তবলা এইসব রাখা । মালবী ডুবে আছে সুরে ।

সুরের মূর্চ্ছনা এক অপার্থিব জগতে গড়ে তুলেছে তার চারপাশে । ভালোলাগছে সুস্নাতর । খুব ভালোলাগছে । সপ্তসুরের দোলায় মন মাতাল ।

ওর অস্তিত্বটা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে । কম্পনের তালে তালে ।

দ্রিমি দ্রিমি , তা না না দ্রিম দ্রিম ---------

মালবী গায়িকা । সঙ্গীতকার । কিন্তু কেউ রেকর্ড বার করবে না । তাদের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করতে হবে সবার আগে ।

যাক্ গে ও বান্ধবীকে পেয়েই গেছে । এগোতেই দেখে মালবী ভ্যানিশ !

ওর গলার স্বর ভেসে আসছে দোতলা থেকে । ছুট্টে যায় সুস্নাত ।

সিঁড়ি বেয়ে । স্পষ্ট মালবীর গলা শুনতে পেয়েছে । একতলা তাহলে জেট ল্যাগের কারণে ----

দোতলায় মালবী বক্তা । একমনে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে । সামনে মাইক্রোফোন ।

কত গভীর গভীর কথা বলছে সে ! পরিবেশ দূষণ , মঙ্গলে সভ্যতা স্থাপন এইসব ।

মালবী ইন্তেলেকচুয়াল হয়ে গেলো ! যাব্বাবা ! তবুও ওকে কেউ স্পিকার হিসেবে ডাকে না । ডাকে নিজেদের লবির লোকেদের ।

ওরা আগে এইসব ইন্তেলেকচুয়ালদের নিয়ে হাসতো । খালি সবসময় নিজের সৃষ্ট জাগতেই থাকে । কী যেন ভাবে ! উড়ু উড়ু মন , আলুথালু বেশবাস । জীবনকে উপভোগ করতে জানেনা ! পার্টিতে দামি সুরা নিয়ে কোমড় দুলিয়ে নাচেনা ! ও একটা জীবন হল নাকি ?

আজ সেই মালবী হয়ে গেলো ইন্তেলেকচুয়াল ! যাক্ কিছু কথা হোক । দেখা যাক সে কি বলতে চায় !

এগোতেই তিনতলা থেকে ওকে ডেকে বসে মালবী , ওর নাম ধরে । দোতলাও ভ্যানিশ ।

জেট ল্যাগ আবারও ।

তিনতলায় মালবী উকিল । একটি কেস নিয়ে লড়ছে । আজব কেস । একটি বড়লোকের কম্পিউটার গেমস্ প্রেমী পুত্রকে কেউ হত্যা করেছে । রেডিও অ্যাকটিভ বস্তু দিয়ে । কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি । মালবী বার করেছে মাথা খাটিয়ে যে গেমস্ থেকে একটি থ্রি ডায়মেনশন্যাল ক্যারেকটার বেরিয়ে এসে তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্প্রে করে মেরে ফেলেছে ছেলেটিকে । এখন প্রমাণ খুঁজছে কারণ আইন প্রমাণ চায় । মালবী ধুরন্ধর উকিল । মালবীর রাশি লিব্রা । লিব্রারা ভালো উকিল হতে পারেনা । ওরা ভালো জাজ হতে সক্ষম । কারণ লিব্রা ন্যায়ের জন্য লড়ে । আর উকিলের লড়াই ক্লায়েন্টের জন্য , ন্যায়ের জন্য আদৌ নয় ।

মালবী এত ধুরন্ধর উকিল হল কীভাবে ? ভাবতে বসে সুস্নাত । কিন্তু কেস সলভ হয়না । ওপর মহল থেকে চেপে দেওয়া হয় । এক নির্দোষ ব্যাক্তিকে ছেলেটির বাবা দোষী সাব্যস্ত করেন যার ওপরে তার অনেকদিন ধরেই রাগ ছিলো ।

এবার মোবাইলে ডাইরেক্ট কল আসে মালবীর । চারতলায় ডাক । বলে : দেখে যা সু দেখে যা কান্ড !

সুসজ্জিত চারতলায় মালবী লেখিকা । বাংলার নামী পত্রিকার সম্পাদক নিতাই দত্তের পদলেহনে ব্যস্ত । কারণটা সহজেই অনুমেয় - লেখা ছাপাতে চায় ! নিতাই সম্পাদক কিন্তু আদতে ছিলো গুন্ডা , বহু নিরীহ মানুষের রক্তে ওর কালি লাল , হ্যাঁ ও লাল কালি দিয়েই শুধু লেখে । লোকে বলে -তাজা রক্ত । এখন সে এক বড় পত্রিকার সম্পাদক । পূর্বাশ্রমে বাচ্চু গুন্ডা ।

মেয়েটি গদগদ গলায় বলে : আপনার মতন লেখকদের লেখা পড়েই তো আমরা লিখতে শিখি ! আপনি যদিও নারীদেহের সৌন্দর্য্য নিয়ে লেখেন না তবুও আমি একটু এক্সপোজ করি , দেখুন না আমার স্তনযুগল কত্তো সুন্দর । আমি ছুঁতে দেবো ! আর আমার নিজের একটি কোড অফ কন্ডাক্ট আছে । স্তন ও দেহের অন্যান্য অংশ আমি ফ্রিতে বিকাই । যা ইচ্ছে নিন, শুধু আমার স্বপ্ন ঐ লেখাগুলি যেন বার হয় ।

ছি ছি ছি :: মালবী এত নিচে নামতে পারে ! সামান্য লেখা ছাপানোর জন্যে এত্তো নোংরামো ?

কি জঘন্য ব্যাপার স্যাপার ! ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুস্নাত ! নাহ্ তার এতদূরে আসাটাই ভুল হয়েছে !এইভাবে লেখা হয়ত প্রকাশ পাবে কিন্তু কাঁচা লেখাগুলি তো পড়েই পাঠক বুঝতে পারবেন তখন এটাও বুঝবেন কী উপায়ে তা প্রকাশ পেয়েছে , তাতে কি আর কেউ ওকে রেস্পেক্ট করবে ?

সম্পাদক আবার বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করে দিলে খুশি হয়ে লেখা ছাপান । নচেৎ যতভালো লেখকই হোন না কেন -- নো চ্যান্স !!

সুস্নাত একটু হতাশ হয় । এমন সময় দৌড়ে এসে মালবী ওকে টেনে নিয়ে যায় পাঁচতলায় ---সেখানে সে এক সন্ন্যাসিনী । যাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই একটুও অথচ ধর্ম কর্ম করে যাচ্ছেন । আসলে লোক ঠকানো ব্যবসা আর কি ! এসেছিলো শুদ্ধ মনে সাধিকা হতেই কিন্তু আশ্রমের চাপে পড়ে আজ মানবসমাজের নব ভন্ড ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ।

এইভাবে প্রতিটি সোপানে মালবী । প্রতিটি তলায় । অভিনীত হচ্ছে জীবনের মহাকাব্য ।

অ্যাপার্মেন্টের ছাদে চড়তে মালবী ওর হাত ছাড়িয়ে লাফ দেয় শুন্যে ।

তারপর ভারহীন দেহ উড়ে যায় কোনো অচিন দেশে । মালবী আর আসবে না । বলে যায় ।

সিঁড়ি চড়ে চড়ে সে ক্লান্ত । এবার দম নিতে চায় । জীবনের প্রতিটি ধাপে এত বোঝা পড়া আর ভালোলাগেনা তার । নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন জাগে । আমি কে ? কেন এখানে ? কী আমার উদ্দেশ্য ! শুধু সন্তান ধারণ ও পালন ? প্রতিভার স্বীকৃতি কেউ দেয়না , অনাথ প্রতিভাবানের চেয়ে পাবলিক রিলেশান এজেন্ট রাখা মধ্যমেধা হওয়া ভালো ।

সবাই সুযোগ সন্ধানী । যে ডালে বসে সেই ডাল মহাকবি কালীদাসের মতন কেউ কাটতেও চায়না তাই প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনা ! মালবীরা এইভাবেই হারিয়ে যায় এক একটি বহুতলের ধাক্কায় । লক্ষ লক্ষ সুস্নাত পারেনা তাদের বাঁচাতে --- সময়মতন মহাসমুদ্র নীলে স্নান করে এসেও ।

গল্পটি মন্দ লেখেনি বান্ধবী তার ।

এই উপাখ্যান পড়ে রাত্রি জানতে পারলো যে ওর বান্ধবী ডুলুং রায়ের প্রথম প্রেম এক সাধারণ মানুষ কারণ ওর স্বামী ছিলেন এক এয়ারফোর্সের উচ্চপদস্থ অফিসার । অবসরপ্রাপ্ত এই মানুষটি

ছিলেন ওরই দেশ ডেলিয়াতে । ডেলিয়া বরফ ও ফুলের দেশ । শীতের সময় ওখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ হয় । খুবই ঠান্ডা ।

সেই ভদ্রলোক বয়সে যেহেতু ওর থেকে অনেক বড় , প্রায় ৬৫ আর ও ৩৫ তাই ওকে সন্দেহ করতেন । যদিও মুখে কিছু বলেন নি । পরেরদিকে তুমুল ঝগড়া হত ও একদিন উনি ডুলুং এর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন কারণ উনি যেই ল্যাবে ডিজিট্যাল সিগন্যাল প্রসেসিং নিয়ে কাজ করতেন সেখানে ডুলুং এক তরুণ প্রফেসর এর সাথে একদিন সৌজন্য বিনিময়ের সময় আলতো চুমু খেয়েছিলো । প্রফেসর মন্ডল আহত । খুবই আহত । ওঁৎ পেতে থাকেন সুযোগের অপেক্ষায় যেমন শ্বাপদ একবার শিকার ধরলে ছাড়ে না ।

সুযোগ এসেও যায় । খ্রীস্টমাসের আগেই একদিন একটু বেলা করে ডুলুংকে উনি ল্যাবে ডেকে নিয়ে অ্যাসিড মারেন । ছোট বিকার তুলে মুখে ছুঁড়ে দেন মারণ তরল । অম্ল ।

জ্বালায় ডূলুং ছটফট করে কিন্তু কাউকে এই বিষয়ে কিছুই বলেনি । ওর মুখের একটি দিক পোড়া ছিলো । চিকিৎসককে বলে যে নিজেরই গাফিলতিতে এরকম হয়েছে ।

একটু নিচে লিখেছে যে ও ক্ষমা করতে পারে ।

কাছের মানুষকে বাঁচিয়ে দেয় ।

স্বামী কিন্তু তারপর ওকে ত্যাগ করেন । আলাদা থাকতেন । ডুলুং তখন শেরপা হিসেবে নিযুক্ত হয় একটি অ্যামেচার দলে । যারা অভিযাত্রীদের নিয়ে হিমবাহ ইত্যাদি অভিযানে যায় । ওর গুরু এক নেপালী শেরপা , তেম্বা কাশাং নাম । নেপালের তেনবোচে নামক এক বহু পুরাতন গ্রাম থেকে সে এসেছিলো ডেলিয়াতে , এক প্রকার পালিয়ে ।

কয়েকজন সাহেব পর্বতারোহীকে বরফ কাটার কুঠার দিয়ে মারতে যায় ওর এক সাথী কারণ তারা হিমালয়ের উচ্চতায় এমন সব কাজে লিপ্ত ছিলো যা ওর সাথীর মতে অপমানসূচক ।

ওরা বলে : এতে পুরো শেরপা জাতকে কেউ যেন হেয় না করেন । এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা । তেম্বা বলেছে ওর বাবা শেরপা ছিলেন , ওর দিদি মহিলা শেরপা হতে চেয়েছিলো । পরিবার আপত্তি তোলে । ওদের ওখানে মেয়েরা শুধু ঘরের কাজ করে , সন্তান প্রতিপালন করে । ওরা পাহাড়ে চড়াকে পেশা হিসেবে নেয়না । তেম্বার দিদি নিতে চেয়েছিল কিন্তু ওর বাবারা ওকে দূরের গ্রামে বিয়ে দিয়ে দেন ।

কয়েকটি সন্তান হবার পরে সে পালিয়ে এসে শেরপা হবার চেষ্টা করে একদিন । ওর স্বামী ওকে ধরে নিয়ে যায় । তারপরে সে আর কোনোদিন আসেনি, নাহ্ ওদের বাড়িতেও না । দিদির খবরও ওরা আর জানে না । পরে তো সেই বিশেষ মারপিটের ঘটনায় তেম্বা জড়িয়ে পড়ে ।

সেই কারণে পুলিশ তেম্বাকেও খোঁজে । সে পালিয়ে আসে এখানে । এই দেশ ডেলিয়াতেও তো বরফ আছে । সেখানে সে কাজ করে । শেরপার কাজ ।

শিষ্যত্ব নেয় ডুলুং । যদিও দৈহিক ক্ষমতার জন্যে সে বেশ পিছিয়ে ।

ডেলিয়াতে একটি গ্রাম ছিলো সুউচ্চ পাহাড়ের কোলে । নাম জালাবাল্লা । সেই গ্রামে কেউ থাকতো না প্রায় ৫০/৬০ বছর । বরফ এর চাঁই এসে পুরো গ্রামকে নস্যাৎ করে দেয় ।

সবাই পালায় । কেউ কেউ নিহত হয় বরফের নিচে পড়ে ।

শেষে অনেক বছর আর বরফ না পড়ায় লোক আসতে শুরু করে । ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সভ্যতা । আলো জ্বলে । দোকান বসে, বাজার বসে। মানুষে ভরে যায় চরাচর । তবে বেশির ভাগই টুরিস্ট । স্থানীয় লোকের সংখ্যা মাত্র ১২০ । একটি মাত্রই গোরস্থান - পাহাড়ের শীর্ষে । সেখানে কবরগুলি ঢালু । পাহাড়ের গা বেয়ে ।

গোরস্থান থেকে দেখা যায় গোটা শহর । প্রতিটি মানুষের জীবনী ওখানে লেখা , পাথরের ফলকে । যারা শায়িত । চিরঘুমে । ওখানে ইতিহাস ছোঁয়া যায় , প্রতিটি কবর কথা বলে ।

শীতে বরফে আচ্ছন্ন থাকে । এখন এই গ্রামেই নাকি থাকেন ডুলুং এর প্রাক্তন স্বামী । নদীর জল যখন জমে যায় উনি কি হাতে জমা

নদীর থেকে বরফের খন্ড তুলে ভাবেন ডুলুং এর কথা ? ভাবেন যে বড় ভুল হয়ে গেছে ?

ডুলুং এর ওকে ভালই তো লাগতো । তাই তো ওর সাথে জীবন জুড়ে নেয় । অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও । মনে রোমান্টিক মেয়েটি ওর মনের মানুষটিকে ভাবে চিরহরিৎ ।

বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও সে ছিলো সমর্পিতা । তাই তো বিয়ে হল । ধুমধাম করে ।

ভদ্রলোক মজেন ওর প্রাণবন্ত স্বভাবে । আয়নার মতন মনে ।

কিন্তু কোথায় যেন বেজে ওঠে বিসর্জনের বাজনা । ডুলুং হারিয়ে যায় । ওর চিরহরিৎ মানুষের ভুবন থেকে ।

সে লিখেছে : আমার মাথাটা ফিজিক্যালি না হলেও ইমোশন্যালি ও কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে ডুলুং এর জলে । ডাকাতে কালী পূজারি রাজাদের মতন ।

উনি নাকি স্নানঘরে ক্যামেরা লাগিয়ে স্পাই-য়িং করতেন বৌয়ের ওপরে । পরে সেগুলি নিয়ে গোলমাল হয় আরো । আন্তর্জালে তুলে দেবার হুমকি দেন ।

ভদ্রলোকের মা ছিলেন বসতির মানুষ । অরণ্যে পাতা কুড়ানি । এক চালা ঘরের বাসিন্দা । দিনরাত পাতা কুড়িয়ে কাটতো । একমাত্র ছেলেকে মানুষ করার কোনো চেষ্টা ছিলো না । দুবেলা খাদ্য জোগাড় করাই ছিলো ওর উদ্দেশ্য । পাতা কুড়িয়ে , কাগজ

কুড়িয়ে যাদের দিন চলতো তারই পুত্রকে একদিন নিয়ে গেলো এক ধনী ব্যবসাদার। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে নিজের সঙ্গী করে রাখেন। উনি একাকীত্বে ভুগতেন তাই অনেক বাচ্চা ওর বাড়িতে পুষ্যি। স্ত্রী পলাতকা।

ছেলেটি নিজ বাড়িতে ভোজ খেতো সেদিন- যেদিন ওদের বাসায় গন্ধ লেবু দিয়ে ডাল -ভাত খাওয়া হত। ধনীর দুলাল হয়ে সে মূর্গ মসালা ও বিরিয়ানিতে ডুব দিলো।

পরে এয়ারফোর্স এ যান। নন কমিশন্ড হয়ে ঢুকলেও পরে কমিশন পেয়ে যান।

কাজ করতেন খুব ভালো। প্লেন সারাতেন। ফাইটার প্লেন। কাজেই লোকে দেশের অন্যত্র ডেকে নিয়ে যেতো। ধীরে ধীরে সিঁড়ি চড়া।

পাতা কুড়ানি মা দেখা করতে আসতো ধনীর বাসায়। কোনো নিয়ম ছিলো না যে প্রবেশ করতে পারবেন না। বরং আদর পেতেন। বসতেন বারান্দার মেঝেতে। হাঁটু উঁচু করে।

- মায়ের জন্যে একটা ইট রাখা ছিলো, পার্মানেন্ট।

ডুলুং কে বলেছেন উনি।

মায়ের আঁচল বিছানো ছিলো কিন্তু ভদ্রলোক দূরে দূরে থাকতেন। কারণ মায়ের গা থেকে ততদিনে আঁশটে গন্ধ বার হত, ছেলের মনে মনে।

তবুও তো মা তাই ছেলেকে দেখতে আসতেন প্রায়ই । ইটে বসে মুড়ি ও বড় গ্লাসে চা পান করে চলে যেতেন ।

ওদের বাসায় আরো ছয়টি কিশোর ছিলো । দুজন মিজো , একটি সাঁওতাল , দুটি রাজস্থানী , একটি দক্ষিণী । সবই পথ থেকে কুড়িয়ে আনা ।

ডুলুং এর স্বামী একমাত্র বাঙালী । তবুও ওদের সবার সাথে মিলেমিশে ছিলেন ।

নানান রাজ্যের ভাই । ভাই ভাই । নেই খাই খাই । লড়াই ।

ব্যবসাদার একটি কিংবা দুটি ন্যানির সাহায্য নিয়ে এদেরকে গড়ে তোলেন ।

প্রফেসর মন্ডল তখন ডিপ্লোমা ইঞ্জীনীয়ারিং এর কোর্স করে বায়ুসেনায় ।

অন্যরা নিজ নিজ পথে । ব্যবসাদারকে ওরা বলতো : বাবি ।

ছোট থেকেই তাই মন্ডল সাহেব মাল্টি কালচারে অভ্যস্থ ছিলেন । তবুও ডুলুং কে নিয়ে ওর মনে নানা সন্দেহ দানা বাঁধে । ডুলুং আয়ত আঁখি , মনোলোভা । আয়নার মতন মন । সাহসী যদিও ঈষৎ লাজনম্রা, স্পষ্টবাদী । ঋজু । স্বতন্ত্র ।

মন্ডল সাহেব এর ক্রুকেড মন । অমানিশার মতন আঁধারে ঘেরা ।

ডুলুং লিখেছে যে বিয়ের পরে ওর স্বামী সোহাগে অসুবিধে হত ।

প্রথমে তো পাকা ৬ মাস ওরা সেক্স করেনি । ঘনিষ্ঠ মূহুর্তে ওর মনে হত ভদ্রলোক ভালগারিটি করছেন ।

ওকে নগ্ন করলে ও ক্ষেপে যেতো । বলতো : একি অসভ্যতা ! ছি:---

হয়ত ভদ্রলোক পরে ভেবেছেন যে ওর বয়সের কারণে ডুলুং ওকে অবজ্ঞা করে অন্য কোনো পুরুষের বাহুলগ্না হত । নিজ কমবয়সী পাতানো ভাইদেরও নিজ বাড়িতে আসার হুকুম ছিলো না । ডুলুং এর কারণে । মন্ডল এমনই মানুষ ।

মন্ডলের মনের রহস্য বোঝার ক্ষমতা ডুলুং এর ছিলো না । সে শুধু তাকে গভীর ভালোবেসেছিলো ।

ও লিখেছে : আজকে রাতে কালপুরুষ দেখলাম । আমার বাড়ির উঠোন থেকে রাতে কালপুরুষ দেখা যায় । আকাশটা কত বড় , তাই না ? আমরা কত ক্ষুদ্র । যদি নক্ষত্রপুঞ্জে উড়ে যেতে পারতাম ! মানুষের কান্না কি ওরা শুনতে পায় ??

জানালার বাইরে মৃদু শব্দ । এখন সকাল । সুন্দর এক স্বর্ণালী সকাল । পাড়ার কালোমেম হুদা এসেছে । ওর স্বামী চিকিৎসক । একজন সাচ্চা ডাক্তার যার আদর্শ জননেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ।

বলেন : এরকম দেবতুল্য মানুষ শতাব্দীতে একটিই আসেন ।

বড় ছবি লাগানো ঘরে নেলসনের । কোমল মুখ যা লৌহ মানবের কাজের বিন্দুমাত্র আভাস দিতে অক্ষম ।

রোজ মোমবাতি জ্বালান ডাক্তার , হুদার স্বামী আকিনসিন ।

বড় ডাক্তার । নরম মন । ভালো মানুষ ।

- আজকাল তো ভালোমানুষেরই বড় আকাল , বলে ওঠে রাত্রি শিলোত্রি । হুদাকে উদ্দেশ্য করে । হুদা মিষ্টি হাসে । কালোমেমকে হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় । হুদার মাথায় অজস্র বেণী । ছোট ছোট সার দেওয়া বিনুনী । ব্যাড়ার মতন করে বাঁধা ।
মাঝে মাঝে রাত্রিকে ডেকে খাওয়ায় । ওদের মতন করে রান্না করা সব খাবার । ভালই লাগে । ভদ্রলোক মিতভাষী । তবে হাসেন , বৌয়ের মতন করেই ।

হুদা দেশে থাকতে সোসাল কজ নিয়ে কাজ করতো ।
ওদের দেশের মেয়েদের, একটি গ্রামীণ শাখায় , স্নানের সময় ধর্ষণ করে দেয় স্থানীয় পুরুষেরা কারণ মেয়েরা নিজেদের উন্মুক্ত করলে লোক জড় হয়ে যায় বিজন নদীকূলে । ওখানে নারীরা দূর্বল । হুদা ওদের হয়ে গলা ফাটাতো ।
রাত্রিকে বললো : মেয়েরা দূর্বল বলেই সব জায়গায় আক্রান্ত হয় । তবে এইসব পশ্চিম দেশে তার সংখ্যা অনেক কম । এখানে মেয়েরা নিজেদের উন্মুক্ত করে রাখলেও লোকে দেখেনা । ওরা নিজেদের শরীর দেখানোকে একটি আর্ট মনে করে ।

একটি দেশে তো শুনেছি যেইসব মেয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে তাদের লোকে হেয় করে । বলে : তোমার দেহে কোথাও খুঁত আছে নাকি হে ? এরকম প্যাকেজিং করে রেখেছো কেন ?

রাত্রি শুনে যায় চুপ করে ।

হুদা অনেক গল্প বলে । ওদের দেশের । মেয়েদের সমস্যা । আরো নানাবিধ ।

একটি এলাকায় নাকি ছেলেরা খুব চুরি ডাকাতি করতো ।

কাঁচা ঘরে ঢুকে রাতের আঁধারে চুরি করতো । পরে ওখানে হুদার সংস্থা নিয়ম করে চোর ধরতো । তবে শাস্তির বদলে ওদেরকে শিক্ষা দেওয়া হত । দেখা গেলো বেশির ভাগই অভাবে চোর । স্বভাবে নয় । তখন ওদের নানান হস্তশিল্পের শিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষা দিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হল । এখন ওরা কেউ কেউ শিক্ষাদান করে -নিজ বিষয়ে । অনেকে আবার হস্তশিল্পের ইস্কুল চালায় । কেউ বনে বনপালকের কাজ নিয়েছে । ওরা শুধরে গেছে ।

- মানুষ মাত্রই ভুল হয় । কিন্তু তাকে বাঁচার সুযোগ দেওয়া উচিৎ ।

মিষ্টি হাসি হুদার মুখে । ওর পতিদেবের সাথে আলাপ ঐ সংস্থায় । উনি ওখানে ডাক্তারি করতেন ।

কালোমেমের মন মজলো ।

গায়ের চামড়া কালো হলেও একটি চকচকে ভাব আছে ওদের । মিহিন বরণ , মিঠেল মন । দরদী হিয়া । পাশবিক কিছু নয় যেমন

সাদা চামড়ারা ভাবতো - তাই এলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ! সাদাদের মন ভোলাতে ।

এখন হুদা এখানে একটি খাবার দোকান চালায় ।

ব্যবসাটি অদ্ভুত বিশেষ করে এক অ্যাফ্রিকানের জন্যে । ও শ্রীলংকার এক মানুষের কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলো । ভদ্রলোক হোটেল চালাতেন । হুদা ওখানে কিছু অথেন্টিক খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয় । একটি নামজাদা খানা : হপার্স ।

অন্যটি মুড়িঘন্ট । ফিশ হেড কারি । এখন ও মুড়িঘন্টের দোকান চালায় । একেবারে ভিন্ন সংস্কৃতির খানা । তবুও হুদা সাহসী । হুদা অ্যাডভেঞ্চারার্স ।

- রোমহর্ষক অভিযানের নামই তো জীবন । তা হোক না শুরু মুড়িঘন্ট দিয়েই !

কালোমেম মুখে আলো এনে , গালে টোল ফেলে হেসে ওঠে !

রাত্রি নিরামিষাশী হলেও আজকাল নন ভেজ খায় । মুড়িঘন্ট খেয়েছে । ওর এক বাঙালী বান্ধবী মোহিতা চ্যাটার্জ্জী বলেছে যে বাঙালীরাও খুব মুড়িঘন্ট খায় এবং তা একটি ডেলিকেসি । মোহিতা খেয়েছে একদিন হুদার দোকানের খানা । ওর ভালো লেগেছে । এলোকেশী গোধূমবর্ণা মোহিতা বলেছে : অ্যামেজিং ।

মোহিতা ডাইভোর্সড্ । ওর স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়েছেন । অনেক দু:খে আছে বেচারি । পেটে টিউমার ধরা পড়ায় ওকে ত্যাগ করেছেন ওর দীর্ঘদিনের বিয়ে করা স্বামী । তাই নিয়েই অবশ্য

মোহিতা মুড়িঘন্ট খেয়েছিলো । ও খেতে ভালোবাসে । ওর আয়ু আর কয়েক বছর । চিকিৎসক বলেছেন । ওর যা অসুখ তাতে ও আর বেশিদিন বাঁচবে না । ও অবশ্য বলে : মরবোই তো , তা খেয়ে মরবো !

খুব ভোজন রসিক ওর স্বামীও । আজব মেয়ে কিন্তু মোহিতা ! ওর স্বামীর বাড়িতে গেস্ট এলে এই ভদ্রলোক ওকে ডেকে নিয়ে যান রান্না করার জন্য ।

আর ও যায়ও !

এত অবহেলা সত্ত্বেও । বলে : আমার আর কদিন আয়ু , কি লাভ ঝামেলা করে !

নির্লজ্জ ভদ্রলোক বাড়িতে অতিথি এনে, অসুস্থ স্ত্রীকে ডেকে রান্না করায় , নিজে রন্ধনে পটু নন তাই । একবার রাত্রির সাথে মোলাকাৎ হয়েছিলো , শপিং মলে । চোখ মটকে বলে ওঠেন :

- হ্যাল্লো মিসেস শিলোত্রি , এক গাল হেসে বলেন মোহিতার স্বার্থপর পতিদেব ।
- অ্যাম মিসেস টাইসন , নট শিলোত্রি । ইটস্ মাই মেডেন নেম ।

বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায় ।

পরে লোকটি মোহিতার কাছে এই নিয়ে নালিশ জানায় ।

- তোমার বান্ধবী তো আমাকে অ্যাভয়েড করলেন । সি ওয়াজ সো রিলাকটেন্ট টু টক টু মি !

মোহিতা যা বলে নি তা ওর মনের যন্ত্রনা । মনের দু:খ খুলে সেই মানুষকে কি আর বলবে যে স্ত্রী অসুস্থ হয়েছে বলে সম্পর্ক নষ্ট করে ?

-সম্পর্ক চিরটাকাল এক থাকেনা রে , বলেছিলো রাত্রিকে । বুক ভরা ব্যাথা নিয়ে । টক ঝাল মিষ্টি তেতো সবরকম স্বাদই পাওয়া যায় । আজ যে মনোহরিনী কাল সে ডাকিনী !

চোখ ভিজে ওঠে , মোহিত হবার মতন কথা তো নয় এগুলি !

ওষুধ খেয়ে অসুখ এখনো কন্ট্রোলে আছে । ছোঁয়াচে নয় এই যা ! আজকাল ক্যান্সার ঘরে ঘরে । আগে ক্যান্সার হলে লোকে তাকে দেখতে যেতো এখন ক্যান্সার না হলেই বুঝি লোকের গোত্র নিয়ে সংশয় দেখা দেয় !

- আপনার পরিবারে একটি ক্যান্সার নেই ?

কেমন তর মানুষ আপনি ? কোন গ্রহ থেকে এসেছেন ?

মোহিতা হপার্স-ও খেয়েছে । রাত্রিও খেয়েছে , শ্রীলংকার জনপ্রিয় খানা । লঙ্কার মানুষেরা ভীষণ লঙ্কা খায় । খুব ঝাল খেতে ওরা অভ্যস্থ ।

মুড়িঘন্টে একটি বিশেষ মশলা দেয় তাতে বড়ই সুস্বাদু হয় এই খানা । মুড়িঘন্ট অবশ্যই বাঙালী মশলার থেকে ভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি । ভাত , রুটি সহযোগে খাওয়া চলে । প্রয়োজনে দোসা কিংবা ইডলি !

আন্তর্জাল থেকে লিখে এনেছিলো হপার্স সম্পর্কে , মোহিতা । নোট আছে রাত্রির কাছে । ওরা তৈরি করার কথা ভেবেছিলো । নিচের রেসিপি দেখে করেছিলো , ভালো করতে পারেনি । এগ হপার্স টি দেখতে অনেকটা ডিমের পোচের মতন । এছাড়া মিল্ক হপার্স ও প্লেন হপার্স দেখেছে । মিল্কটা তে নারকোলের দুধ দেওয়া মনে হল ।

ছোট কড়াইতে ব্যাটার ঢেলে ভেজে তোলা হচ্ছে , অনেকটা পেপার দোসার মতন দেখতে । পাশটি মুচমুচে । তাতে সুস্বাদু হয়েছে কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ। লোকে গপাগপ খায় । একটি চাটনি দেয় ওর সাথে ,খুব ঝাল । পেঁয়াজ ,সর্ষে ও লঙ্কার সমাবেশ । আরেকটি চাটনি দেওয়া হয় । সেখানেও নানান মশলার কারিকুরি । বেশ লাগে চাটনিগুলি ।

Hoppers (Appa)

Another food native to Sri Lanka, served mainly for breakfast or dinner and often accompanied by lunu miris, a mix of red onions and spices. Hoppers are made from a fermented batter of rice flour, coconut milk and a dash of palm toddy, which lends a sour flavor and fermentation ability. If toddy is not available, yeast is often used. The batter is left to rise, then cooked in a hemispherical wok-like pan. There are many types of hoppers including egg hoppers, milk hoppers, string hoppers, and sweeter varieties like *vandu appa* and *pani appa*.(Wikipedia)

হুদা গল্প করছিলো যে ওর দোকানে এক মা তার মেয়েকে নিয়ে খেতে আসেন । ওরা ভারতীয় । মেয়েটি বাচ্চা কিন্তু দেখতে ১০০ বছরের বুড়িদের মতন । ওর মুখটা দেখলে মনে হবে যেন ও কোনো বৃদ্ধা , বয়সের ভারে ন্যুব্জ । খুব দু:খিত ওর বাড়ির মানুষ কারণ ওর আয়ু মাত্র কয়েক বছর । ভালো করে খেতে অক্ষম । হপার্স খেতে পারে তাই ওকে নিয়ে আসেন ওর মা ।

প্রজিরিয়া (সময়ের আগে বুড়িয়ে যাওয়া) এই রোগ এর নাম ।

মেয়েটি কথাও বলে কেমন ফ্যাসফ্যাসে গলায় । ওর বাবা মেয়েটির এই রোগ প্রকট হবার পরে ওদের ফেলে চলে গেছেন কারণ উনি মনে করেন যে ওর মা-ই এই দূর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী । মা কে দৈহিক ভাবে অত্যাচার সইতে হয়েছে এই কারণে । এখন একটি দক্ষিণী দোকানে হিসেবের কাজ করেন ও মেয়েকে নিয়ে থাকেন ।

বলেন : ও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায় আমি একজন সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবো ! আবার ঘর বাঁধতে ভয় হয় ! কে জানে ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ডরায় । সন্তান হলে আবার যদি তাকে হারাতে হয় !

মেয়েটির ছবি দেখিয়েছে হুদা। শিশু একটি তার চোখ দুটি সরল , নিষ্পাপ অথচ দেহ যেন লোলচর্মের ভারে কাহিল !

হাসছে , মুখ খুলে , কিন্তু দুধের দাঁত ক্ষয়ে গেছে !

- প্রি ম্যাচিওর এজিং , বলে উঠলেন হুদার স্বামী ।
ঘন কফির কাপ বাড়িয়ে দেন রাত্রি দিকে । এই কফিতে দুধ দেবার নিয়ম নেই , রাত্রির তাই তেতো লাগে !

হুদা স্বামীর খুব প্রশংসা করে । বলে : রাতে বাড়ি ফিরে ও প্রায়ই রান্না করে ফেলে । ঘর সাফ করে । নানান রান্না করে । ওর

কয়েকজন রুগীও মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে । ওরাও খেয়ে যায় । ডাক্তার সাহেব খুবই রসিক ও পন্ডিত । খাদ্য রসে পরিপূর্ণ ওর ভান্ডার । তাই এত রুগী আসে । ওদের ব্যাক্তিগত সুখ দু:খ নিয়েও আলোচনা হয় । ডাক্তারের এক রুগী চৈনিক । চীন দেশে বাবাকে দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি । সরকার ওকে জেলে পুড়ে দিয়েছেন ওর বাবার ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কারণে । এখন নাকি এইদেশের অর্থাৎ ডেলিয়ার সরকার ওকে ফিরিয়ে আনার প্ল্যান করেছে । এখানে অনেক চীনা মানুষ । ওর রুগী সাপ খায় ।
সরকার চীনদেশকে খুব সমীহ করে চলে ।

বিদেশে তো কাজের লোক সহজে রাখে না কেউ । এত গ্যাজেটস্ আর সুবিধে যে নিজেই করে ফেলা যায় সমস্ত কাজ । এখানে নিজের বাগান সাফ যেমন নিজে করা যায় সেরকম মেশিন নিয়ে নানান টুকিটাকি কাজও করা যায় । যারা হাঁটতে অক্ষম তাদের জন্যে আছে কাছাকাছি যাবার তিন চাকার যান । ফুটপাথ দিয়ে চলে সেই গাড়ি । ছোট সাইজ । সেই গাড়ি চড়ে লোকে দোকান বাজার করে ।

হুদার স্বামী আকিন বড় ভালোমানুষ । পেশায় চিকিৎসক । উনি একদিন আড্ডার সময় বলছিলেন যে ওদের দেশে ওর গ্রাম পাহাড়ের পাদদেশে । সেখানে রাতে হিংস্র হায়েনা আসে। ছোট ছোট বাচ্চারা তার হুকারে কেঁদে ওঠে ! সেই বনজঙ্গল পেরিয়ে স্কুলে যেতেন উনি । পরে শহরে গিয়ে চিকিৎসা বিদ্যা রপ্ত করেন । হবার বাসনা ছিলো সাইকিয়াট্রিস্ট । কিন্তু প্রবল অর্থাভাবে হন সাধারণ চিকিৎসক ।
রাত্রি তো সাইকোলজিস্ট । আকিন কালোবরণে হাসি এনে উজ্জ্বল করে তোলেন চারিপাশ । তারপরে মৃদু স্বরে সিগারে সুখটান দিয়ে বলে ওঠেন : সাইকোলজিস্ট যদি জয়ী হন তাহলে

সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন হবেনা ! শুধু শুধু অত ওষুধ খাইয়ে কি হবে ? কাউন্সেলিং টা জরুরি । অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অতিরিক্ত ওষুধ দিয়ে রুগীকে আরো অসুস্থ করে তোলেন । তার চেয়ে তোমার মতন সাইকোলজিস্টরাই ভালো । শুধু কথা বলে, মনোবল বাড়িয়ে সারিয়ে তোলেন ।

রাত্রি ওর বাঙালী বান্ধবী ডুলুং এর কাছে শুনেছে যে বাংলায় এরকম একটি সিনেমা আছে , দ্বীপ জ্বেলে যাই ।
তাই অল্প হাসে । আকিনকে ওর ভালোলাগে । খুবই মার্জিত মানুষ উনি । কোনো কোনো মানুষের সঙ্গ আমাদের পরিণত করে , স্নিগ্ধ করে । আকিন সেরকমই এক মানব সন্তান । সহনশীলতা , ক্ষমা , মানবিকতা ওর হৃদয়ে ধ্বনিত হয় প্রতি মূহুর্তে ।
তাই ভালোলাগে ।
উনি বলছিলেন ওদের দেশে অভুক্ত বাচ্চাদের কথা। অপুষ্টিতে ভোগা কালো কালো কতগুলি মানুষ যাদের দেখলে মনে হবে দেহগুলি মজবুত সীসার কিন্তু ভেতরে ধরেছে ক্ষয় , খাদ্যের অভাবে ।

অনেক সম্ভাবনা ওদের মধ্যে । কিন্তু দেহ দূর্বল । আকিন দেশে ফিরে ওদের মধ্যে কাজ করতে চান শেষ বয়সে ।
বলেন : ওরাই তো আমার আপনার, আপনজন । এ তো পরবাস । আমি তো ওদের মধ্যে থেকেই এসেছি ! আজ যা হয়েছি তা ওদের নির্মল হৃদয়ের পরশেই । আমি যেদিন শহরে পড়তে যাই তার আগের দিন , সারারাত হায়েনার আক্রমণকে তুচ্ছ করে দলে দলে মানুষ আমার বাড়িতে এসেছিলো । আমাকে স্বাগত জানাতে ।
আজ প্রতিক্ষণে ওদেরকে মিস করি । এখানে কাজ হয়ে গেলেই আমি ওখানে ফিরে যাবো ।

এখানে প্রজিরিয়া আর আমার ওখানে অপুষ্টি । সারা দুনিয়াই এক সুত্রে গাঁথা । সব জায়গাই দু:খ , বেদনা ।
আমি মলম লাগানোর কথা ভাবি ।

আকিন সাহেবের কাছেই একটি অদ্ভুত গল্প শুনেছিলো রাত্রি । ওদের ওখানে শহরে একজন কালো মেয়ের একটি ছেলেকে ভালোলাগে । সেই ছেলেটিও প্রেমে মজে । ওরা পত্রবন্ধু ছিলো । দেখা করার পর ছেলেটি জানতে পারে যে মেয়েটি কালোমেম । প্রেমিক সাদা চামড়া । বিচ্ছেদ হয়ে যায় । ছেলেটি দূরে সরে যায় । কিন্তু বেশিদিন প্রিয়তমাকে ছেড়ে থাকতে পারেনা তাই একটি আজব ডিল হয় । মেয়েটি একটি মুখোশ পরে ওর কাছে আসবে । রাতেও সঙ্গমের সময় মুখোশ খুলবে না । তাহলে ছেলেটি ওকে গ্রহন করবে ।আশ্চর্য হল এই যে মেয়েটি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় । তারপরে ওদের বিয়ে হয় । হতশ্রী রমণী প্রেমাস্পদের এই অদ্ভুত ডিলকে কেন মেনে নিলো অনেক সাহেব ও মেমসাহেবের কাছে তা বিস্ময়কর কিন্তু আকিন বলেন যে একে বলে কম্প্রোমাইজ । ওরা সুখী । খুশি । মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি ?

মুখোশটি একটি রমণীয় রমণীর । তৈরি করেছেন এক ভাস্কর । উনি রবারের মূর্তিও বানান । ওর স্টুডিওতে অনেক রবারের মানুষ আছে । সব ফরমাইশি । কারো যদি কোনো মানুষের ওপরে রাগ হয় তখন উনি অর্ডার দিয়ে রবার মানুষ বানাতে পারেন । সেই মানুষকে দেখতে হবে আসলে মানুষের মতন । তারপর উদ্যোক্তা এসে রবার মানুষকে পিটিয়ে , কেটে টুকরো টুকরো করে গায়ের ঝাল ঝাড়বেন ।

এতে স্ট্রেস কমে যায় । মানসিক অবসাদ কিংবা অন্যান্য ব্যাধিমুক্ত হয় মানুষ । অনেকে খুন করার প্রবণতা মনে মনে কিংবা অবচেতনে রোপন করলেও এই স্টুডিওতে এসে রাগ কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন । তাই ভাস্কর বেশ বিখ্যাত মানুষ ও ভালোবাসারও ।

উনি আবার মানুষকে কাউন্সেলিং করার জন্যে ওর মনোবিদ স্ত্রীর সাহায্য নেন । কেন রাগ , কি তার উৎস , কতটা রাগ , কি করলে রাগ উপশম হবে , মন ঠান্ডা হবে এইসবই মনোবিদ নির্ণয় করেন তারপরে সৃষ্টি করা হয় এক একটি রবার মানুষ ।

- মানুষ আজকাল অহেতুক বড্ড টেনশান নিচ্ছে । আমরা কি চাই ? আনন্দ । সেই আনন্দ খোঁজার আছিলায় ভেঙে পড়ছে মন । ডুব দিচ্ছে বিষাদের গহ্বরে । চাই চাই আর চাই । চাইনা-র আজ আর কোনো স্থান নেই । মানুষ ফেলিওরকে বেজায় ভয় পায় । আগে আমরা ছিলাম স্পোর্টিং । এখন জীবন যেন একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র । তাই আবির্ভূত হন রবার মানুষেরা । মনের টালমাটাল অবস্থার সামাল দিতে ।

একদিকে রোবট আর অন্যদিকে যান্ত্রিকতাকে ব্যালেন্স করতে আজ রবার মানুষ ।
টালমাটাল অবস্থা ভাস্করের মেয়ের আদতে । মেয়েটি কাউকে ভালোবেসেছিলো । প্রতারিত হয়েছে । প্রায় উন্মাদ হবার মতন অবস্থা । খুব ভালো ভাস্কর্যের হাত ছিলো । শৈশবে ও পরে বাবার কাছে বসে বসে দেখতো নিপুন কাজ । নিজেও গড়তো । আবার ভাঙতো । আবার গড়তো ।

প্রেম ভেঙে গেলো তার । চৈনিক প্রেমিক । একসাথে ছিলো কিছুদিন । তারপর ছেলেটি অন্য নারীতে গেলো । মেয়েটি পাগলের মতন হয়ে যায় । বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে ।
ইংল্যান্ডে চলে যায় । ওখানে পার্কে ও পথে কাটাতো । দিনের পর দিন শুধু নানান চিজ খেয়ে থাকতো । ঐভাবেই জীবন ধারণ করতো । মেয়েটি রূপসী । সত্যি রূপ যেন গা বেয়ে পড়ছে । তবুও পথে থাকতো । তেমন বিপদে পড়েনি । ঝড় বৃষ্টিতে ট্রেন স্টেশানে থাকতো । শেষে একদিন এক বুড়ির সাথে খুব দোস্তি হল । বুড়ি ওকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলো । তখন ইংল্যান্ডে শীত পড়েছে ।
বুড়ি ওকে জর্ডানে নিয়ে গেলো । ওখান থেকে ইজরায়েল ।
বুড়ি আসলে কসমেটিক্সের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলো । সেই প্রসাধনী তৈরি হত ডেড-সির নোনা জল ও খনিজ দ্রব্য দিয়ে ।
এই বস্তুগুলি নাকি খুবই উপকারী । নোনা জলের জন্যে এই সমুদ্রে কোনো জলজ প্রাণী নেই । তাই এমন নাম । মৃত সাগর প্রাণসঞ্চার করলো ঐ মেয়েটির । হ্যাঁ , ওর কোনো নাম নেই । সবার নাম থাকেনা । কেউ কেউ নামহীন , গোত্রহীন হয়ে বেঁচে থাকতেই ভালোবাসে । সৃষ্টিশীল তো আগেই ছিলো । এবার হল শিল্পী । ভাস্কর নয় । বুড়ি নানান প্রসাধন দ্রব্যের কভার ডিজাইন করতে লাগলো সে । আমরা ওর নাম দিলাম পূজারিনী । ও শিল্পের পূজারিনী । ভাস্কর্যের হাত দূর্দান্ত হলেও সে তেমন আঁকিয়ে নয় । তাই শুধু লাইন ও ডট কিংবা প্রয়োজনে ত্রিকোণ ও বক্স দিয়ে সৃষ্টি করতে লাগলো এক একটি চমকপ্রদ নক্সা । চোখের আরাম দেয় সেইসব কলা । তাই বুঝি বুড়ির কভার দেখেই লোকে জিনিস কিনতে লাগলো ।
হু হু করে বাড়লো সেল । আর প্রোডাক্টগুলি তো ভালই । বেশ ভালো । কাজে নাম হল মেয়েটির । অবশেষে দেখা গেলো ঐ দেশে

কাপ প্লেট বিছানার কভার , সোফা সব কিছুতেই মেয়েটির চিত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ।
ডট লাইন ও বক্স । রঙ এর জ্ঞান অসাধারণ ছিলো । এক একটি চিত্র সহজেই মন কাড়ে ।
মৃত মেয়ের মনে হিল্লোল তোলে মৃত সাগর ও মৃতপ্রায় এক অচেনা বৃদ্ধা ।
জীবনের এই মজা ।
কোন বাঁকে কী অপেক্ষা করে আছে কেউ জানেনা । তবুও আমরা ছুটে চলি কিংবা থেমে যাই কখনো কখনো ।
সন্ধ্যা আসে রোজই কিন্তু প্রতিটি সন্ধ্যা ভিন্ন ।

মেয়ের কথা মনে করেই রবারের মানুষ বুনন । ভাস্কর ও তার স্ত্রীর। একে ওরা আখ্যা দিয়েছেন সমাজ সেবা ।
মেয়ের কথা ভেবে অন্যের মন সারানোর এক অকল্পনীয় ব্যবস্থা ।
মেয়ে আর ঘরে ফিরবে না । ওরা জানে । সেই বুড়ি এখন মেয়ের সব , ইহকাল পরকাল । নবজীবন দাত্রী । তবুও মেয়ের মা প্রতিটি ভিন্ন সন্ধ্যায় ওর কথা মনে করে একটি প্রদীপ ভাসিয়ে দেন নদীর জলে । প্রদীপগুলি সৃষ্টি করেন ওর দুখী পিতা । যিনি রবারের মানুষ গড়ার কারিগর । যেই মানুষ কাটলে নকল রক্তও বার হয় ।

শিল্পী মনের মেয়ে ও তার পিতা এক অলিখিত গল্প , বন মর্মরে ।

হিমবাহের পাশে কেউ সাবমেরিনে বাস করতে পারে ?

হ্যাঁ পারে । নাম তার ডুলুং রয় । রাত্রির বান্ধবী । আজ সে হারিয়ে গেছে কোন সে অজানায় ।

ডুলুং একটি সাবমেরিনে থাকাকালীন এই ডাইরির অনেক অংশ লিখেছে । জলযানটি ওখানে কে নিয়ে গেলেন আর কেন তার উত্তর কেউ জানেনা । পুরাবিদেরা মনে করেন কোনো এক সময় হয়ত সেই দেশের সরকার এই সাবমেরিনটি যা কিনা ওদের নৌবাহিনীর যান সেই সুবিশাল বস্তুটিকে লোক চক্ষুর আড়ালে করার জন্যে ঐ হিমবাহের রাজ্যে নিয়ে গেছেন । হয়ত কোনো বড় ক্যারিয়ারে করে ।

তবে সঠিক খবর কেউ জানেনা ।

ডুলুং লিখছে যে এই সাবমেরিনটার অন্দরে আছে সমস্ত কিছু । কিচেন, বারান্দা , শোবার ঘর , ডাইনিং হল , ক্ষুদ্র কেবিন , মেশিন রুম এমন কি একটি পেরিস্কোপ পর্যন্ত , যা দিয়ে ওপরের আকাশ দেখা যায় । তারা , গ্রহ নক্ষত্র ।

ডুলুং এর খুব ভালোলাগে । সত্যিকারের সাবমেরিন সে চড়েনি । এই মিথ্যে জলযানই আজ তাকে রহস্যের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে । কে বা কারা এর বাসিন্দা ছিলো সে জানে না । তবুও ভালোলাগে ।

পড়তে চেয়েছিলো অ্যাস্ট্রো গ্লেসিওলজি ।

চাঁদ , মঙ্গলে আছে পানি । সেই পানির মূল সন্ধানে মানবজমিন ব্যস্ত । সেই সাবজেক্টই অ্যাস্ট্রো গ্লেসিওলজি ।

ডুলুং ভেবেছিলো বরফের আনাচে কানাচে ঘুরে এগুলি জেনে নেবে । কিন্তু উচ্চশিক্ষিত পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আজ সে

অর্ধশিক্ষিতা । অ্যাস্ট্রো গ্লেসিওলজি বহুদূরে । সাধারণ মাপের এক শেরপা সে । বরফের হাতছানি এড়াতে পারেনি বলে ।
সাধারণ গ্র্যাজুয়েট । কেমিস্ট্রিতে বি এস সি । কি করবে সে ?
করার কিইবা আছে ?
হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সময় বই ছিলো না । একটা মেয়ের জন্যে কেউ টাকা খরচ করে ? করবে না । কাজেই নো বই । নো স্নেহ । নো মমতা । শুধু গালি । ডুলুং এর ভাইরা সব পেতো । জামাকাপড় , ভালো খানা , আদর যত্ন । ওর বেলায় সব ফাঁকি ।

রাতের পর রাত ওর বাবা মা ওদের তিন ভাইবোনকে সেক্স করে দেখাতো ।
পাশের বাড়ির ঝুম্পা , তার বোন রুম্পা, ভাই অশোকও ওদের বাবা মাকে দেখতো , সেক্স করতে । ওদের মা -টি অত্যন্ত কামুক । রোজ সেক্স করতো । একদিনও বাদ পড়তো না । মা কে ওরা নগ্ন দেখেছে , বাবাকেও । ন্যুড হয়ে ওর বাবার ওপরে উঠে : আহ্ আহ্ করে ক্ষুধা মেটাতো ওদের জননী , স্বর্গাদপী গরিয়সী । ওর বাবা ওর মায়ের বক্ষজোড়া নিয়ে চটকাতো । যেমন কাজের মিনুমাসী রোজ সন্ধ্যায় আটা মাখে , রুটি করার জন্যে ।
ওরা তিন ভাইবোন দিনের বেলায় হাসাহাসি করতো । আটার দলা নিয়ে চটকে দেখাতো কে ওর বাবার মতন স্তন মালিশ করতে পারে ।

কম্পিটিশান হত ওদের মধ্যে । কে ওরকমভাবে আটা চটকাতে পারে । ওরা বলতো যে সেক্সের হাতেখড়ি হয়েছে ওদের নিজ বাবা মায়ের কাছে ।
সেই বিখ্যাত গানের প্যারোডিও গাইতো ওরা :
সর যো তেরা টকরায়ে -এর বদলে ---
চাঁদ যো নিকলায়ে
তো বিস্তার পে লেট যাইয়ে
আজা পেয়ারে পাশ হামারে কাহে ঘাবরা য়ে !

পরে স্কুলের বন্ধুদের ডুলুং এগুলি বলেছে , দু:খে । দেখলো অনেকেই বাবা মাকে সেক্স করতে দেখে নিয়মিত । ঋতুস্রাবের সময় সেক্স করতো মিসেস রাধা গুহ । বাচ্চারা ভাবতো মায়ের কেটে গেছে পায়ে টায়ে । ওর স্বামী ভূতাত্ত্বিক । খনন ও পাথরে অবগাহন করে ফিরে এসে মৈথুনে ডুবে যেতেন , সন্তানদের চোখের সামনে ।

যেমন যমজ বন্ধু লব ও কুশ ।ওরা সব শিখে নিয়েছে । তাই তো মাত্র ক্লাস ১১ তে পড়ার সময় দুজনেই নিয়মিত ব্রেথেলে যেতো ।
একবার একজন গায়ে ঘৃণ্য স্কিন ডিজিজ নিয়ে ফেরে । কিছুতেই সারানো যাচ্ছিলো না । চিকিৎসক অবাক।
-এরকম রোগ ভদ্রসমাজে বড় একটা দেখা যায় না । বলেন পারিবারিক ডাক্তার ডা: ঘোষাল - কোথা থেকে এলো এই রোগ ?
অজিত ঘোষাল । পরিচিত চিকিৎসক ।

লব কুশের বাবা ইনকাম ট্যাক্সের খুব সিনিয়র অফিসার , এবং ঘুষখোর ।
কন্টিনেন্ট ট্যুরে যায় নিয়মিত ।

এক ভাই আরেক ভাইকে ঘুমের সময় ম্যাসটার্বেট করিয়ে দিচ্ছিলো ।
মা দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ করে ।
কনডোমে ঔরস ভরে ওর মা কে ছুঁড়ে মেরেছিলো এক ভাই ।
বলে ওঠে রাগে --ইউ বিচ ইউ হ্যাভ টট আস হাউ টু মেক লাভ অ্যান্ড নাও হোয়াই অন আর্থ আর ইউ আটারিং রাবিশ ?

কুশ গিয়ে পাড়ায় সব রটিয়ে আসে । পাড়ার লোকেরা ক্ষ্যাপাতো : কি রে কুশ কেমন হল কাল রাতে তোর বাবা মায়ের ঘষাঘষি খেলা ?
বাবা ওপরে না মা ওপরে ছিলো ? ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছিলো কি ? আহ্ আহ্ আহ্ !

ওর পাশের বাড়ির ফুল্লরা কাকি একবার লবকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার মা তোমার বাবাকে কাল রাতে ঘুমাতে দিয়েছেন তো ?
পরে অবশ্য জানা যায় যে ফুল্লরা কাকি নিজেই এক বিরাট মধুচক্রের সাথে জড়িত । লব -কুশের মা বেহায়া । স্নেহ মমতা ওর অভিধানে ছিলো না । লাস্ট মানি আর পাওয়ার এই তিন সত্যের নামই জীবন -ঐ মহিলার কাছে ।

স্নেহ ভালোবাসায় বঞ্চিত ডুলুং-ও তো !

কেন যেন সে এইসব মেনে নিয়েছিলো । ও লড়াই করেনি কোনো । ভাগ্য বলে ভেবে নিয়েছিলো । খেতে দিতো না । জামাকাপড় কিনে দিতো না ।ভাইরা সব সুবিধে পেতো । মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ভাইদের জন্যে ভালো ভালো মাস্টার ওর বেলায় সব ফাঁকা ।

ওকে মূর্গীর মাংসের গলা আর মুন্ডু দিতো , ভাইরা ভালো ভালো পিস খেতো । সকালে ওদের জন্যে হত রাজকীয় ফ্রায়েড রাইস ও দামী মাছ । এক পিস পাবদা মাছ ও ভুল করে খেয়ে নিলে ওর মা অম্লবর্ষণ করতেন ।

পুজোর সময় ওর জন্যে কিছু কেনা হতনা । ওর ৭৭ বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমাকে ওর মা মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো এক ভাদ্রে ।
লোকে কুকুরকেও তাড়ায় না ঐ সময় । ওর এক পিসেমশাই কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন । কাউন্সিলার । উনি ঠাকুমাকে আশ্রয় দেন । ১০২ বছর জীবিত ছিলেন উনি । জামাই এর গৃহে ।
পরে ওর মায়ের নাম শুনলেই ভদ্রমহিলা ভয়ে কাঁপতেন ।

ওদের বাসায় ওর এক কাজিন থাকতো । সে অসামান্যা রূপসী । নাম রূপসা । আলিপুরদুয়ারের মেয়ে রূপসাকে তার বাড়িতে

রাখতে অক্ষম ওর বাবা ও মা । কারণ তার রূপের ছটা , মিস আলিপুরদুয়ার বলা হত তাকে ।
সামনে ১০ টা ও পশ্চাতে ১০টা যুবক সবসময় চলতো ।
সেই দিদির প্রেমিক ছিলো সুমিত দা , যাদবপুরে কেমিক্যাল পড়তো । পরে রাশিয়ার দিকে চলে যান । ওখান থেকে ওর কাজিনকে চিঠি দিতেন সঙ্গে ওদের অন্য ভাই বোনেদেরও । দেশে এলে বিরাট স্যুটকেসে করে উপহার । বিদেশী উপহারের মোহ ছিলো সবারই । সেই দাদার পাঠানো চিঠি খুলে পড়ে ডুলুং এর মা আবার খাম সেঁটে দিতেন । খামগুলি , সাইড থেকে সরু করে কাঁচি দিয়ে কেটে খোলা হত । পরে ওখানে হাল্কা আঁঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হত ।

পরবর্ত্তিকালে এহেন বিচিত্র স্বভাবের ডুলুং এর মা , ওর বাড়িতে এসে রাত দুটোর সময় ওর বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো । ও ঘুম না আসাতে বাগানে পায়চারি করতে উদ্যত হয় , চাঁদটা আজ খুব বড় --এইভেবে । দরজা খুলে দেখে ওদের বেডরুমের সামনে ওর সত্তর উর্দ্ধা মা দন্ডায়মান ।
ও অবাক হতেই বলে ওঠে : আমি একটি শব্দ শুনে উঠে এলাম ।
কিন্তু ডুলুং তো কোনো শব্দ করেনি !
ওর স্বামী তখন গভীর ঘুমে ।

একবার ওকে বলেছিলো বটে ওর এক বন্ধুর মা: আমার সব শিথিল হয়ে গেছে । আরাম লাগবে না ! তোমরাই তো এখন যুবতী ।

ডুলুং হতবাক । ওকে এসব বলছে কেন ? আর এই বয়সেই বা মৈথুনের কথা বলছে কেন ? ওর বন্ধুর মায়ের সাথে ওর এত ঘনিষ্ঠতা কোনোদিনই হয়নি ।

ওর অন্য এক বন্ধু বলেছিলো : হয় তোর বান্ধবী সুতনুকার মা উন্মাদ নয়ত খুব বড় বদমাইশ ।

ও বলে : আমাকে হয়ত বন্ধুর মতন মনে করতো । তাছাড়া সারাদিন ঘরে থাকা মাসি হয়ত এগুলোকেই অবলম্বন মনে করতো , রাজ্যের সিনেমা পত্রিকা আর মেয়েদের কতগুলি ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাতো । আমি ওকে ভালো ভালো সাহিত্য সম্ভার কিনে দিয়ে আসতাম । পরে মাসি অন্যরকম সব কথা বলতো ।

ঠাকুরের কথামৃত পড়ে মাসির অনেক উন্নতি হয়েছিলো । আমাকে হয়ত স্নেহ করতো তাই গোপন কথাও বলতো । এই মাসির এক বোন অর্ধ উন্মাদ ছিল, নাম টুকুমণি আমরা বলতাম টুকু পিসি । খুব ভালো গান গাইতো পিসি । কিন্তু অদ্ভুত কথা বলতো : আচ্ছা ঐ যে নালাটা বয়ে যাচ্ছে ওর জল কি আমার গায়ে এসে লাগছে ?

অথবা : আচ্ছা ঐ টেবিল ফ্যানটা ঘুরছে , আমি কি ওতে কেটে ফালাফালা হয়ে যাবো ?

ওদের অবাক লাগলেও , দু:খও হত টুকু পিসির জন্যে ।

খুব ভালো গান গাইতো তো : অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা , অন্ন দাও মা নিরন্নে , মাগো ঢাকো প্রাঙ্গন নবান্নে -----

এত সুন্দর লাগতো , প্রাণ জুড়িয়ে যেতো।
পিসির জন্যে হৃদয় প্লাবিত হত , দু:খ কণায় । পিসিকে পরে ওরা একটি হোমে দিয়ে আসে ।
মানুষের জীবন ব্যাথায় ভরা । প্রতিটি মানুষের ভিন্ন দু:খ , বেদনার ভিন্ন সুর ।
কেউ বেরিয়ে যান কেউ সেই মর্মবেদনা আঁকড়ে তলিয়ে যান দুখ দরিয়ায় , এই তো জীবন । তবুও লাইফ গোজ অন -----

ওর নিজের মা তো ওর মাসী ও মাসতুতো বোনকে খুব গুরুত্ব দিতো । মাথায় তুলতো । মাসী ওকে অপমান করে গেলেও চুপ করে থাকতো । মাসী ও তার কন্যা ডিপ্রেশানে কাহিল । গপাগপ ওষুধ খেতো । সেটাও ওর মা ওর কাছে চেপে রেখেছিলো । মাসতুতো বোন, এখন হার্ভার্ডে গবেষণা করে সে ওর আরেক কাজিনের স্বামীকে প্রেমপত্র দেয় । বত্রিশ বছরে হতশ্রী মেয়ে । অবসাদ রোগগ্রস্ত । কোনো বয়ফ্রেন্ড জোটেনি । তাই এই ব্যবস্থা । তাদেরকেই সমস্ত সম্পত্তির অংশ ওর মা দিয়ে যায় । ওকে কানাকড়িও দেয়নি ।
এই বিষাদগ্রস্ত মেয়েটি আবার নিজ ভাইয়ের সংসারে প্রায়ই গোলমাল বাধাতো যার জন্যে বৌদি গৃহছাড়া । ভাইয়ের শেষে ডাইভোর্স হয়েও যায় । ভাই খুবই ইনোসেন্ট ও বোন অন্ত প্রাণ । সে সবসময় লেখাপড়া নিয়েই থাকে , ভোলাভালা। ও লিখছে কয়েকটি পাতা বাদ দিয়ে : শৈশব ও কৈশোরে বাবা মাকে সেক্স করতে দেখলে খুব

অসহায় লাগে ! ভীষণ ইনসিকিওর্ড লাগে । প্রথমে বোঝা তো যায়না এটা কী হচ্ছে তারপরে মনে হয় : আমি এবার কোথায় যাবো !
ওর মা ওদের ভাইবোনেদের কোনোদিন মাতৃদুগ্ধ খাওয়ায় নি । ব্রেস্টের শেপ খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে । ওরা ফিডিং বোতলের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে ।

ওর বন্ধু বৈভব মজুমদার তো উন্মাদ হয়ে গেলো এই কারণে । বাবা ও মায়ের রমণ দেখে দেখে ও অ্যাংজাইটি ডিসর্ডার ও ডিপ্রেশানে চলে যায় । এখন অর্ধ মানুষ । স্কুলে পড়ায় । অন্য সময় পাগলামো করে , চেঁচায় ।

ডুলুং এর মা কোনো সাধারণ মহিলা নয় । বিদেশে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃতা । ওর বাবাও বিজ্ঞানী । কিন্তু ওর মা ওর বাবাকে চেপে দিয়েছিলো । ক্যারিয়ার যাতে ফুলে ফেঁপে না ওঠে তার সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলো । বিদেশে গিয়ে অন্য সাহেবদের সাথে ইন্টিমেট ড্যান্স , বাবার সম্পর্কে কুৎসা রটানো --স্বামী বিশ্বাস করে যেতে দিয়েছিলেন । তার এই প্রতিদান ।

ডুলুং এর কাকার ক্যারিয়ারও ঐ মহিলা শেষ করে দেয় ।

জঙ্গল থেকে একটি রোগগ্রস্ত মার্জারকে নিয়ে আসে মহিলা । বাড়িতে কাকা ওকে পোষে । কাকা ছিলেন মার্জার প্রেমী । সেই রোগের কবলে পড়ে ওনার দুই পা কেটে বাদ দিতে হয় । উনি ছিলেন দৌড়বীর । স্পোর্টস ম্যান । ওরা ভেবেছিলো এটা নিছক দূর্ঘটনা । কিন্তু পরে জানতে পারে যে ওর মা আদিবাসীদের কাছ থেকে ঐ মার্জার নিয়ে আসে। বুনো বেড়ালটি রোগে আক্রান্ত বলে আদিবাসীরা ওকে মেরে ফেলতে গিয়েছিলো । তখন ওর মা তাকে নিয়ে আসে ।
ডুলুং লিখেছে : আমার জীবন ঘাত প্রতিঘাতে ভরা এক নির্জীব উপাখ্যান , যা পড়তে কারো ভালোলাগার কথা নয় । আমি এক হেরে যাওয়া মেয়ে । লাইফের দুপাশে-- বিগ জিরো !

ও একবার অন্তঃসত্ত্বা হয় । মিসক্যারেজ হয়ে যায় বাথরুমের সামনে পিছলে পড়ে । পরে প্রকাশিত হয় যে ওর মা কে এক কাজের লোক , বহু পুরাতন ভৃত্য বুধনের মা দেখেছিলো : দরজার মুখে সাবান জল ঢেলে রাখতে ।

শুন্যতায় ভরা , ক্লান্তিকর , বিষাদময় ভুবন তার । ডুলুং রায় ।
যার উজ্জ্বল চোখে ছিলো হিমবাহ বিশারদ হবার স্বপ্ন ।
যার চোখে স্পার্ক দেখে ওর বাবার মাস্টার মশাই , এক জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছিলেন : ওকে খুব ভালো করে গ্রুমিং করো । ওর চোখে আলো আছে , অবিনশ্বর আলো ।

এগুলি নিয়ে ও কাউকে কিছু বলেনি । কারণ যতই বেদনার হোক - ও ডার্টি লিনেন , পাবলিকে কাচা পছন্দ করেনা ।

রিয়েল লাইফ ঘটনা নিয়ে একটি ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হয় । বইটির নাম তো একটা আছে তবে রাত্রির মনে হয় নামটি যদি হত **লাইফ ইজ আ জার্নি** তাহলে মানাইসই হত । পাঠকেরাই লেখে এখানে । তাদের জীবন যুদ্ধের কাহিনী ।

রাত্রি পাতা ওল্টায় , এক এক করে উল্টে যায় । ডুলুং এর ডাইরিতে বড় বাস্তব যা মনে হতে পারে অবাস্তব । তাই এই ম্যাগাজিনের পাতায় চোখে গেলো !

পড়ে বেশ ভালোলাগলো । প্রথমটি এক ফায়ার ফাইটারের গল্প ।
ছেলেটি এক সুদূর গ্রাম থেকে বড় শহরে ফায়ার ফাইটিং এর কোর্স করতে
এসেছিলো । অনেক মানুষ দরখাস্ত দিয়েছিলেন তার ভেতরে কয়েকজন মাত্র সুযোগ পেয়েছেন ।
ছেলেটি , ধরা যাক নাম জ্যাক এরকমই একজন ।
জ্যাক লিখছেন যে অনেক আশা বুকে নিয়ে এসেছিলেন । গ্রামের সবাই টাকা জমিয়ে বিরাট পার্টি দিয়েছিলো এলাকার ছেলের সম্মানে । কিন্তু জ্যাক বেচারা শহরে এসে ভেঙে পড়ে । একে বড় শহর , সব অন্যরকম । তার ওপরে যেদিন প্রথম কোর্স শুরু হল

সেদিন হল এক বিপত্তি । একটি দম বন্ধ হওয়া ঘরে ওকে ঢুকিয়ে আটকে দেওয়া হল । চারদিকে কালো ধোঁয়া । কাশতে কাশতে প্রাণ যায় । প্রায় পালিয়ে বাঁচেন উনি । এক দুদিন ট্রেনিং করেই ফিরে যান গ্রামে । কারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এরকম কাজ করা । গ্রামের সবাই হতাশ । এক বীর যুবককে ওরা সম্বর্ধনা দিয়েছিলো , পরিয়েছিলো রাজতিলক । আজ সে ফিরে এসেছে গৃহে , ভয়ে । পরাজিত হয়ে ।

ভালো কি লাগে ?

ছেলেটিকে চিঠি পাঠালেন প্রোগ্রাম হেড । লিখলেন যে অনেক মানুষ ঢুকতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার মধ্যে গুটিকতক সুযোগ পেয়েছেন । তুমি সেই ভাগ্যবানেদের মধ্যে একজন । আর হেলায় ফেলে চলে যাচ্ছো সব ? তাহলে এসেছিলে কেন ?

চিঠির কথা শুনতে যতই সাধারণ হোক লেখাটায় কিছু ছিলো । তাই বুঝি জ্যাক ফিরে গেলেন এবং সব বাধা পেরিয়ে হয়ে উঠলেন এক প্রথম সারির অগ্নি সেনা । বুঝতে পারলেন জীবনে সাফল্য আসে ব্যর্থতার হাত ধরেই । ব্যর্থতাকে যাঁরা স্বীকার করতে জানেন না তাঁরা হারিয়ে যান অতল গহ্বরে । অন্ধকারের পরেই আসে আলো । হিম শীতের পরেই বসন্ত --শুধু আলোর পিয়াসী হতে হয় ।

পরের ঘটনাটি প্রেমের । এক নার্সের প্রেম কাহিনী । অল্প বয়স্ক এক ডায়বেটিস রুগী ভর্তি হলেন হাসপাতালে । অল্প বয়স থেকে এই অসুখে আক্রান্ত কিন্তু নিয়মিত ইনসুলিন নিতেন না বা ডায়েট

ব্যায়াম করতেন না তাই চোখ অন্ধ হতে চলেছে । এসেছেন চিকিৎসা করাতে । নার্সের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলেন কিন্তু হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে কোনো চিকিৎসক বা নার্স , পেশেন্টের সাথে ব্যাক্তিগত লেভেলে মিশবেন না । তাই মনের কথা রয়ে গেলো গোপনে । জানা গেলো চোখ সারবে না । আস্তে আস্তে পুরোপুরি লোপ পাবে দৃষ্টি । মেয়েটির ভারি দু:খ হত । তবুও চেপে রাখতো আবেগ । শেষমেশ যেদিন ছাড়া পেলো ছেলেটি সেদিন বললো : আমার গ্রামে এসো । আমরা কফি খাবো । আমি মেঠো রং ভালোবাসি । একটি মেঠো ড্রেস পরে এসো ।
আসবে তো ?

মেয়েটি না গিয়ে পারেনি । কথা হল , গল্প হল তারপর বিবাহ । বাড়ির লোক মানা করলো একটি প্রায় অন্ধ , ডায়বেটিস রুগীকে জীবনসাথী হিসেবে বরণ করতে ।
শোনেনি মার্থা । বিয়ে করতে হলে করবে গ্রেগ কেই । হলও তাই । গ্রেগ এখন রেগুলার ইনসুলিন নেয় । কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে । কিডনি , হার্ট সমস্ত ড্যামেজ হয়ে গেছে । সময় খুব কম । আর চোখ তো গেছেই ।
একটি সন্তান হল । পেগি । পেগিকে কোলে নিয়ে গ্রেগ অনুভব করলো মার্থাকেই ।
ক্ষুদে পেগিকে আবছা দেখলো । একটু জ্যোতি হয়ত তখনো ছিলো । অস্তরাগের আলো ।

যেদিন পেগি জন্মালো তার পরদিন থেকেই পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেলো গ্রেগ ।
একটু খানি আলো চোখে ছিলো মেয়েকে দেখার জন্যেই ।
আজ সে হেঁটে চলে বেড়ায় ।
গ্রেগের বাইপাস হয়েছে । কিডনির অবস্থাও শোচনীয় । ডায়ালিসিস করতে হয় ।
ওপাড়ের ডাক এসে গেছে । মার্থা বাঁচবে পেগিকে বুকে নিয়েই ।
সমাপ্ত হবে আশ্চর্য প্রেম কাহিনী কোনো এক অভিশপ্ত লগ্নে ।

পেগি বাবার ভারি ন্যাওটা । ড্যাড ড্যাড করে ক্ষুদে হাতে জড়িয়ে ধরে গ্রেগকে । মার্থা দূরে বসে দেখে আর ভাবে প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর কেন ? পিতা ও কন্যার এই মিলন ক্ষণস্থায়ী । কিছুদিন পরেই মিলিয়ে যাবে বাতাসে । কোনো শক্তি কি পারবে একে অমর করতে ? বিষাক্ত কর্নিয়ায় জ্বলছে অঙ্গার । মেয়ে হাঁটছে তাকেই আঁকড়ে ধরে ।
বিষাদবেণুর তালে তালে ।

শেষ ঘটনা একটি মেয়ের । পিতৃবিয়োগ হবার পড়ে মা আর পুরুষ সঙ্গ করেন নি ।
মেয়েটি যখন প্রায় যুবতী তখন নতুন প্রতিবেশী এলেন । তার যমজ ছেলে । মায়ের সাথে বেশ ভাব হল ওদের । কাছাকাছি রেস্তোরাঁতে যেতে কিংবা লন্ড্রী ও বাজারে যাবার সময় ওরা একসাথে যেতে শুরু করলেন যা মেয়েটির ভালোলাগতো না । ও

প্রতিবাদ করে । ফল হয়না । শেষে ও কলেজে গেলে ওরা মিলিত হতেন ।

মেয়েটি খুবই বিরক্ত হয় । একদিন দেখে ওরা বিয়ে করবে স্থির করেছে । ওর মা ওকে এসে বলেন : প্যাট আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন , তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত ।

মেয়ে বিরক্ত হলেও মুখে সম্মতি সূচক হাসি এনে অভিনন্দন জানায় ।

বিয়ের আগে মা একটি সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়েডিং গাউন কেনেন । গাউনটি অপরিষ্কার । তাই ধুতে দিতে হল । হবু বর গাউন ফেরৎ নিয়ে আসেন লন্ড্রী থেকে ।

তখন মেয়েটি এক চাল চালে । মায়ের অবর্তমানে গাউনে ঢেলে দেয় বিট জুস ।

লাল লাল ছোপ হয়ে যায় । গাউনটি জলে ধুয়ে রেখে দেয় যাতে বোঝা না যায় যে দাগ গুলি টাটকা । কিছুদিন পরে বিয়ের ফুল ফুটলো । বাঁশি বাজলো । মা গাউন পরতে গিয়ে দেখেন যে তাতে লাল ছোপ । হবু বরকে বকাঝকা করেন যে লন্ড্রী থেকে দেখে আনেন নি কেন !

উনি বলেন : খেয়াল হয়নি ভেবেছিলেন যে ওরা দেখে নেবেন ।

মেয়েটি খুশি হয় , ভাবে বিয়ে ভেস্তে যাবে । কিন্তু বাস্তবে হয় উল্টো ।

ওর মা- অন্য সাধারণ পোশাক পরে বিয়ে করতে যান । এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

প্যাট মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতন স্নেহ করা সত্ত্বেও কেন সে এই কাজ করেছিলো আজ ভাবে , মনে মনে ।

বইয়ের পাতা শেষ করে ওটা বন্ধ করে উঠে যায় রাত্রি । এখন গভীর রাত্রি ।

বাইরে আধো আলো আধো ছায়া , ছায়া হিন্দোল । গাছের পাতায় নীরব হিল্লোল ।

কখনো বা একটানা শোঁ শোঁ শন শন শব্দ ।

ডুলুং এর ডাইরি নিয়ে শুয়েছে । রোজ কিছুটা করে পড়ে ফেলে ।

ও লিখেছে যে এক ক্লাবে ও যায় যেখানে ছুরিকা নৃত্য হয় । নানান জাতের ধারালো ছুরি নিয়ে লোকে খেলে ও নাচে ওখানে । কিছু কিছু নাচ বেশ অশ্লীল । গোপন অঙ্গে ছুরি চালিয়ে কেটে রক্তক্ষরণ করানো হয় । এর থেকে অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য রক্তের ব্যাধিও হয় । নাচগুলি ভয়ানক । খুব লাউড বাজনা সহযোগে হয় । বেশ এনার্জি লাগে ওরকমভাবে নাচতে , আর মানুষ এতে নাকি বাঁচার অর্থ খুঁজে পায় । স্থবির ভুবনে আনন্দের ঢেউ তোলে এই নৃত্যকলা । ডুলুং এই নাচে অংশগ্রহণ করেছে কিছুদিন । ও যে বেঁচে আছে সেটা পরীক্ষা করেছে দেহ থেকে রক্ত ক্ষরণ হওয়ায় ।

চামড়া ফালাফালা হয়ে গেছে বহুবার । ডুলুং জীবিত তাই খুশি । রক্তরেখা সর্পিল পথে বয়ে গেছে অজানায় ।

রাত্রি বিছানায় উঠে বসে । টেবিল ল্যাম্প জ্বালায় । উঠে জল খায় । বাইরে একটি সারমেয় ডেকে ওঠে ।

ডুলুং যে এত দুখী ও জানতো না । ওদের পুণায় সে পড়তে এসেছিলো , এক নতুন বছর । ওর গার্ডিয়ান ওকে ওখানে পাঠায় কিন্তু কোনো খরচ দিতো না । ছাত্রাবস্থায় ওকে অনেক অড জব করতে হয় । হোটেলে বাসন ধোয়া , এক বুড়ির দেখভাল , দোকানের কাউন্টারে সেল্‌স গার্ল । তারপরে ও ছোটখাটো কাজ শুরু করে । কেমিস্ট্রিতে ব্যাচেলার্স করায় ও একটি ওষুধ কোম্পানিতে সেলসের কাজ পায় । পরে তো একটু থিতু হয় , বিয়ে করে । ডেলিয়া দেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে ।

ডুলুং ভালো মেয়ে ছিলো, তাই তো রাত্রির বন্ধু হয় । রাত্রি গুড গার্ল । পেশায় সাইকোলজিস্ট । মনোবিদ । কত না শত শত রুগীর মনের রহস্য সন্ধানে ডুব দেয় মহাসমুদ্রে ।

যদিও বান্ধবীর মনের খবর কোনোদিন পায়নি ।

ডুলুং এর স্বামী যেহেতু অ্যালুফ হয়ে যান তাই হয়ত ওর আরেক মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় । নাম পিট টুলি । তার বসবাস এক হিলস্টেশানে , নাম কুং ফিং রূপ । ডেলিয়া দেশে

যখন স্বর্ণ খনির সন্ধান মেলে তখন পিটের পূর্বপুরুষ ওখানে গিয়ে ঘাঁটি গাড়েন । নদী , তা এক সুবিশাল নদী নাম ঝিলং । ঝিলাম নয় , ঝিলং ।

ঝিলং নদীর জলে প্রথম স্বর্ণ কুচি খুঁজে পায় স্থানীয় পাহাড়িরা । পরে মাটি খুঁড়ে বার হয় রাশি রাশি সোনা । সোনার দেশ তখন ডেলিয়া ।

সারা দুনিয়া থেকে মানুষ এখানেই আসছেন , স্বর্ণ সন্ধানে , মাটিতে ও নিজ বাটিতে মানে গৃহে । পিটের দাদু ছিলেন খনির শ্রমিক । ওর বাবা স্কুল পালিয়ে খনিতে ঢুকে সব খুঁটি নাটি শিখতেন , তার বাবার কাছে মানে পিটের ঠাকুর্দার কাছে । এইদেশে বেসিক শিক্ষা সবাইকে নিতে হয় । তাই স্কুল পালানো নিয়মিত

হয়ে দাঁড়ালো যখন তখন পুলিশ ওকে ধরে । পরে ছাড়া পান ।

ভদ্রলোকের জ্ঞান অসীম । সব নখদর্পণে , খনিজ যা কিছু ।

উনি কেক সংগ্রহ করতেন । ওর এক বন্ধু ছিলেন কেমিস্ট । বড় শহরে তার বাস । তিনি বিশেষ কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার করে কেকের মমি বানিয়ে দিতেন । কেক নষ্ট ও ভ্রষ্ট নয় । কেক জীবন্ত । মিশরের মমির মতন ।

সেইসব কেকের মমি ডুলুং দেখেছে পিটের ঘরে । কেকগুলি এইসব দেশে দেখতে দারুণ । যেমন তার রং তেমন রূপের বাহার । ক্রিম

ও নানান গুঁড়ো গুঁড়ো বস্তু দিয়ে সৃষ্ট কেকগুলি যেন এক একটি গহনা বা আর্ট । খাদ্যবস্তু নয় ।

সব সাজিয়ে রেখেছে পিট । ওর কাচের আলমারিতে ।

পিট এখানে একটি বড় তিনতারা হোটেল চালায় । হোটেলটি বহু পুরাতন । প্রায় ১৮৭৮ সনে তৈরি । পরে দাবানলে পুড়ে যায় ।

ভস্মীভূত হোটেলের জমি কিনে পিট ওখানে নব হোটেল রচনা করে ।

এখন এটি একটি তিন তারা হোটেল এবং বেশ ভালো ।

পিট-ই এই গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এনেছে । আগে মোমবাতি জ্বলতো সর্বত্র ।

কাছেই আরেক পাহাড়ে আছে ঘোস্ট টাউন । প্রতি শনিবার রাতে ভূতের সন্ধানে যান মানুষ , সেখানে । অনেক খুন খারাপির ইতিহাস ঐ শহরের আনাচে কানাচে । তাই প্রেতাত্মা বাতাসে ভাসমান ।

ওখানে ঘোস্ট ট্যুরের গাইড সোনালী মেয়ে রোজমেরী ।

রোজমেরীর মা গোয়ার মানুষ । বাবা সাহেব ।

গোয়ার সমুদ্র তটে মা হারা রোজমেরী ছিলো বহুদিন । পরে এক সাহেব দম্পতি ওকে এখানে নিয়ে আসে । মেয়েটির বাবা ওর মাকে

ছেড়ে চলে যায় অনেক আগেই । রোজমেরী পিটকে ভালোবাসে । কিন্তু পিট ওকে বান্ধবীর মতন দেখে ।

ডুলুং ঘোস্ট ট্যুরে গিয়েছিলো তখনই আলাপ ঐ সোনালী মেয়ের সাথে ।

সোনালী মেয়ে কাঁদছে , চোখে তার জল । পিটকে তার চাই , সে নাছোড় বান্দা । কিন্তু পিট ধোঁয়াশা । পিছলে যায় , বারবার ।

মনের কথা তাই বলতে পারেনি পিটকে , ডুলুং । শুধু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলো । রোজমেরীর মুখটা ভেসে উঠতো , মনের ক্যানভাসে ।

পিট এখানে রেলওয়ে এনেছে । আগে খনির বগি ছিলো । পাবলিক রেল চালু হয় ওরই উদ্যোগে । তাই সম্মানিত মানুষ এই চত্বরে ।

এক রাতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ডুলুং এই শৈলশহরে হাজির হয় ।

হঠাৎ-ই একদিন ওর স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় ও একাই গাড়ি নিয়ে নিরুদ্দেশে যাত্রা করে । নিঝুম রাত , রাতপাখির কান্না আর বাতাসের তেজে ভূমি কম্পমান । দূরের আকাশে আধখানা পোড়া চাঁদ , নক্ষত্রপুঞ্জ ও স্বচ্ছ ভিনাস বা শুক্রগ্রহ । হাইওয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছে এক একটি বিশাল গাড়ি ।

কখনো বা সুদৃশ্য লরি , দূরের শহরের মাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে । কোনো কোনো লরির পেছনটি ভাঁজ করা । হয়ত বা ২০/২২

চাকার গাড়ি ওটি । কাজ হয়ে যাওয়াতে এক্সট্রা চাকা ও অংশখানি মুড়ে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে সারথীর পেছনে । মজার দৃশ্য । কিন্তু সেই দৃশ্য উপভোগের মতন মনের অবস্থা নয় তখন ডুলুং এর । গাড়ি চালিয়ে রাত ১০টায় হাজির হয় এক শৈলশহর মেজরগ্যাপে ।

এখানে আগে নাকি সেনা ছাউনি ছিলো তাই এই নাম । সব দোকানপাট বন্ধ । স্তব্ধ ভুবন । নি:শব্দ রাত , নিশির ডাক , কান্না । শুনশান পথঘাট । একটি বড় বিল্ডিং এ কেবল আলো জ্বলছে । গাড়ি ঘুরিয়ে সেখানে প্রবেশ করতেই ছুট্টে এলো অনেক কচিকাঁচা । ওরা কয়েক রাত এখানে থাকবে , ক্যাম্পিং এ এসেছে । তাই সব ঘর ভর্তি । বললেন ম্যানেজার । এত রাতেও ওরা নিজেদের মধ্যে খেলা ও খুনসুঁটি করে চলেছে । ডুলুং নিরাশাবাদী নয় তাই গাড়ি ঘুরিয়ে দিলো । গন্তব্য কুং ফিং রূপ । এখানে খনি আবিস্কৃত হবার পরে বহু চীনা , থাই , জাপানি শ্রমিক আসে নানান দেশ থেকে । সঙ্গে করে নিয়ে আসে ওদের কালচার । তাই দেশের বিভিন্ন শহরের নামও হয়েছে ওদের ভাষায় । কুং ফিং রূপ এরকমই এক শহর ।

শীতের শহর । কফির ঘ্রাণে মাতোয়ারা । আকাশের অক্ষরে , তারায় সব আছে , প্রতিটি বাসিন্দার প্রতিটি অনুভূতি । শহরটি নাতিদীর্ঘ । তাই মধ্যরাতে সব বন্ধ । ডুলুং বেচারি একটি ম্যাকডোনাল্ডে খেয়ে নিলো । তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেলো ক্যারাভান পার্কে । ওখানে সবাই ক্যারাভ্যান গুলি নিয়ে পার্ক করে রাখে ও কয়েকদিন হয়ত থাকে । টয়লেট আছে , আছে ক্ষুদ্র

ঘরও । তবে সবই ভর্তি । ও সেখানেই সারারাত গাড়িতে কাটায় । লাজুক নির্মেদ চাঁদের মধুরিমা মেখে ।

পরের দিন ভোরের আকাশ লাল হতেই সোজা কুং ফিং রূপে, পিটের হোটেলে ।

আলাপ, প্রলাপে পরিণত হতে বেশি সময় নিলো না ।

পিট খুবই বিনয়ী ও মার্জিত ।

নানান গল্প কথায় মেতে উঠলো ওরা । ভারতের কাছে একটি মুসলিম দেশে ঘুরে এসেছে সে তিন সপ্তাহের জন্যে । এক বন্ধুর সঙ্গে যায় যে আলোকচিত্রী ।

রাজধানী থেকে একটি গ্রামে যায় ২৫০ বছরের পুরনো দুর্গাপুজো দেখতে । মুসলিম দেশে হিন্দু দেবীর আরাধনা তাও মুসলিম মানুষেরাই প্রধান আয়োজক । হিন্দু পুরোহিত পুজো করছেন , আছেন অনেক হিন্দু মানুষ । আছেন মুসলিমও । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি । এই দেশেই আবার একদিন রাজধানীতে খোলা তরোয়াল নিয়ে আল্লা হো আকবর স্লোগান দিতে দিতে বহু মানুষ ধাবিত ভিন্নধর্মী মানুষের পানে ।

চমকিত পিট । বলেঃ ধর্মের নামে এত লড়াই , গডের নামে লড়াই ! তা এই গড দেখা দেন না কেন ? এত মানুষ তাঁর নামে মারা যাচ্ছে যখন ! এ কেমন বিচার তার ??

পিটের চোখের দিকে তাকিয়ে ডুলুং । এর উত্তর তার কাছে নেই ।

পিট একটি বেতের চেয়ার এগিয়ে দিলো । পাশে রাখা পাহাড়ি ফুল ।

গন্ধ নেই ফুলে । ঘরে অনেক বই । হোটেলে আছে লাইব্রেরি । ফ্রি রিডিং রুম ।

বেশ পুরনো একটি গন্ধ আছে সেখানে । মোটা মোটা বই , জ্ঞানের খনি , খনি শহর কুং ফিং রূপে ।

পিটের খনিপ্রেমী পিতা একদিন নিহত হন এক মারক গ্যাসে । খনির পরিত্যক্ত

অঞ্চলে এরকম গ্যাস নির্গত হয় অনেক সময় । সেই বিষাক্ত বায়ু নিয়ে নেয় জীবন , অকালে । মা ভেঙে পড়েন । কাজে কর্মে উৎসাহ হারান । তখন ওদের নয় ভাইবোনের দায়িত্ব নেয় ওদের দিদি স্টেফি ।

ওরা দিদির কাছেই মানুষ । মা আর বেশিদিন বাঁচেন নি । দিদি ও ব্যাবসায়ী জামাইবাবু ব্রেট পাগানিনি ওদের মানুষ করেন ।

ওরা নিজেরা নিঃসন্তান ছিলেন এদের জন্যে । সবকটি ভাই বোন দাঁড়িয়ে গেলে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন । এখন পাগানিনি মৃত । দিদি একা । খামার বাড়িতে থাকেন ।

ক্ষেতি বাড়ি করেন , চাষ করেন , হাঁস মূর্গি পালেন । গরু চড়ান ।

তাই পিট এই শহরে । দিদিকে একা ফেলে দূরে যেতে অক্ষম । অন্য ভাইবোনেরা যদিও চলে গেছে নিজ নিজ রুটির সন্ধানে । পিট তবুও মানুষ । মনুষ্যত্বের ধ্বজাটি উঁচু করে ধরে আছে ।

হেসে বলে : দিদি আমাদের মায়ের মতন । তবুও দিদি দিদি-ই মা নন । তাই বুঝি কোলে পিঠে করে মানুষ করা সত্ত্বেও অন্য ভাইবোনেরা মায়ের মৃত্যু দিবসে ক্যান্ডেল জ্বালায় কিন্তু জীবিত দিদির খোঁজ কেউ নেয় না ! যেই দিদি আমার একটি সন্তানের মুখও দেখেনি আমাদের জন্যে ।

পিটের নয়ন অশ্রুস্নাত । ডূলুং নদীও কলস্বনা ।

ডূলুং কথা বলে : তোমার মতন ভাই যে আছে , দেবতুল্য । এরকম দেবতা একটিই যথেষ্ট বাকিরা মানুষ কিংবা অমানুষ হোক না । ওদের হতে দাও ।

পিট বলে : জানো দিদি সেইকালে ঘোড়ায় চড়ে কত মাইল পেরিয়ে , পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে স্কুলে যেতো । আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতাম । ঘোড়া দিদিকে নিয়ে ঝর্ণায় নেমে যেতো জল খেতে আবার কখনো কখনো থেমে যেতো । এক পাও সে আর যাবেনা । কখনও বা লম্ফ দিতো ভয়ে । সে এক অভিজ্ঞতা , দিদির কাছে পরে শুনেছি যখন বুঝতে শিখেছি সব। জীবনের কায়দা কানুন । তবু দিদি দমেনি । দিদি খুব সাহসী । দিদি অমৃতা ।

ভাইয়ের মুখে দিদির গল্প , শুনতে ভালই লেগেছিলো । ওর নিজের ভাইরা তো ওর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিয়েছে । সহোদর ,

একসাথে বড় হওয়া । জীবনের লালসা চাকায় পিষ্ট হয়ে তুবড় গেছে ।

ডূলুং লিখেছে যে ওর পিটের সান্নিধ্য ভালোলাগতো ।

> --------হোয়েন হি ওয়াজ নট ব্রেন স্টর্মিং স্ট্র্যাটেজিস্ হি ওয়াজ আ ফিলোসফার । আমি ওর থট ওয়েভসে চড়ে ভাসতে ভালোবাসতাম ।

কিন্তু বাধ সাধলো রোজমেরী । যাকে গোয়ার সৈকত থেকে কুড়িয়ে আনে ওর পাতানো বাবা মা । সাহেব মেম ।
রোজমেরীর নিজের বায়োলজিক্যাল বাবা মারা যেতেই ওর মা ওকে থিয়েটারে নামায় । সুন্দরী মেয়ে , অল্প বয়সী । সহজেই কাজ পেতো ।
ছেলেমানুষ , খেলাধূলো ছেড়ে যেতে চাইতো না ।
মা মারধোর দিতেন । বলতেন : তুমি কাজে না গেলে আমাদের খাবার জোটানো যাবেনা ।
মা নিজে বেকার ছিলেন । কোনো কাজ করতেন না। মেয়েকে দিয়ে অভিনয় করাতেন ।
রোজমেরী বললো : বাচ্চারা খেলবে , পেরেন্টরা খাবার জোগাড় করবে । এটাই দুনিয়ার নিয়ম হওয়া উচিৎ , লজিক্যালি । দূর্ভাগ্যবশত: আমি সেই নিয়মের বাইরেই ছিলাম ।
ওর পালক বাবা খুবই দয়ালু । ভারতে গিয়ে লেকচারার এর কাজ নিয়ে অনেক বছর থেকে তবেই ওকে দত্তক নিতে সক্ষম হন ।

চাকরিটি নেন কেবল ওকে কোলে তুলে নেবেন বলেই ।
ওর পালিতা মাও ভারি ভালোমানুষ । গোলাগাল মোটাসোটা মহিলা , সদাহাস্যময়ী
লরা ।
আসলে ওদের একটি ছেলে ছিলো । একমাত্র সন্তান । তার গাছ কাটার ব্যাবসা ছিলো । বড় বড় লরি নিয়ে ওরা গাছ কাটতে যেতো । লরি থেকে ইলেকট্রনিক হাত বেরিয়ে এসে গাছের ডালগুলি কেটে দিতো ।
একবার এরকম কোনো মিশনে গিয়ে ছেলে গাছে চড়ে ।
সেইসময় অসাবধানতায় পা হড়কে পড়ে যায় । গভীর কোমায় ছিলো অনেক মাস । শিরদাঁড়ায় মারাত্মক চোট লাগায় চিকিৎসক বিধান দেন যে সে আর কোনোদিন বসতে কিংবা উঠতে পারবে না । সারাটা জীবন শুয়েই কাটাতে হবে ।
মা ও স্ত্রী কেঁদে ভাসায় । ছেলে ইচ্ছামৃত্যু চায় । মার্সি কিলিং । ইউথেনেজিয়া । চিকিৎসক দেশের আইন মেনে রাজি হন কিন্তু বাড়ির মানুষ ভেঙে পড়েছেন ।
ছেলেকে ইচ্ছামৃত্যু দেওয়া হয় । মারা যাবার আগের দিন সে বিরাট পার্টি করে যায় । সেখানে শ খানেক মানুষ আমন্ত্রিত এই আজব উপাখান্যের সাক্ষী হতে ।

--রেবেকা সহ্য করতে পারেনি এই মৃত্যু । অনেক দিন পর্যন্ত অবসাদগ্রস্ত ছিলো । বৌ বলে কথা ! তায় অন্তঃসত্তা ছিলো ।

নিজেই ভারী জিনিস তুলে অ্যাবর্ট করে দেয় ।

এখন এক গ্রামে থাকে সে । অন্ধ সেজে সরকারের কাছ থেকে ডিসেবিলিটি পেনসান আদায় করে । আসলে চোখের জ্যোতি ওর প্রখর । ওর সরকারের ওপরে রাগ আছে । কারণ মার্সি কিলিং আইন যদি পাস না হত আজ ওর স্বামী জীবিত থাকতে বাধ্য হত ।

ছেলেকে হারিয়ে এই দম্পতি হয়ে যান মূঢ় । তাই বুঝি অসহায় একটি মেয়েকে সাগরকিনারে ঘুরতে দেখে তুলে নেন কোলে, গোঠে ।

মেয়ে পেলো ঘর , মা কোল জুড়ালো , অনেকদিন পরে ।

রোজমেরি এখন খুশি । শুধু পিট যদি ধরা দিতো ।

ও এখন ঘোস্ট হান্টিং ট্যুর কন্ডাক্ট করা ব্যাতীত একটি ইস্ত্রীর দোকান চালায় ।

লোকের সময় কম । ওখানে জামাকাপড় ফেলে দিয়ে যায় । একটি বিরাট যন্ত্র আছে । সেখানে শার্ট , প্যান্ট , গেঞ্জি সব লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে গরম বাতাস চালনা করা হয় । তাতে মূহুর্তেই ইস্ত্রী হয়ে যাচ্ছে এক একটি বহুমূল্য ড্রেস । ভালই চলে ওর । শুধু পিট যদি পাশে থাকতো ।

এক মনে নখ খুঁটে চলে প্রেমিক মনের সোনালী মেয়েটি । প্রেমের ভূত ভর করেছে যে ! সোনালী চুল বাবা সাহেব বলে । তাই তো মা থিয়েটারে নামান , অনেক অর্থের বিনিময়ে । সোনালী বরণ ও

গোলাপী রং । এর চাহিদা ভারতে খুবই বেশি । ওর জন্মদাতা পিতা পর্তুগিজ না ফার্সি না স্প্যানিশ সে জানেনা । ওর মা ও কি জানতেন ?

পিটের হোটেলে ছিলেন এক সেলিব্রিটি । যার দর আকাশছোঁয়া । উনি রহস্যময়ী । সিনেমা ছেড়ে বিবাগী । সবাই ওকে খোঁজে কিন্তু উনি মেঘে ঢাকা তারা ।

সেই সেলিব্রিটিকে একবার পিট তার হোটেলে পেয়েছিলো । কয়েকদিন ছিলেন । পিটের সাথে অনেক গল্প করেন । অজানা কথা । পিট দেখে যে উনি একজন আম আদমীর মতনই চেতনা ।

ওনাকে শুধায় : আপনাকে ঘিরে এত রহস্য অথচ আপনি এত সাবলীল, সহজ সরল ! সত্যি ভাবা যায়না !

উনি নীলনয়নে চমক এনে বলে ওঠেন : মিডিয়া আমাকে গডেস করেছে । আমি আসলে রক্তমাংসের এক মানবী যে তুর্কি রুটি ও লেবানীজ কাবাব খেতে খুব ভালোবাসি । যাও আমার জন্যে নিয়ে এসো ।

পিট ধন্য । আকাশের চাঁদ ওর হাতে রুটি খেতে চাইছেন !

রুটি ও কাবাব কেন পিট আরো বহু কিছু ওকে খাবার টেবিলে দিয়েছিলো সেদিন । স্পেশাল গেস্ট বলে কথা !

ফিরে যাবার সময় পিটকে একটি ম্যাপেল পাতায় কালো কালি দিয়ে নিজের নাম সই করে দিয়ে যান ।

পিট নিরাশ হয়ে বলে : পাতাটা তো একদিন শুকিয়ে যাবে ।

রহস্যময়ী মৃদু হাসেন । তারপর বলেন : ওকে ঘিরে রহস্য আর ওর কঙ্কালটি থেকেই যাবে । ফসিল ।

এর কিছুদিন পরেই উনি মারা যান । খুব বড় সিনেমা অভিনেত্রী । মহানায়িকা ।

মারা যাবার পরেই ওর সম্পর্কে নানান নেগেটিভ জিনিস মিডিয়াতে ছাপা হতে থাকে । কবে কি ভুল করেছেন , কত মদ্যপান করতেন , কতটা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার মতলব করেছেন, কতটা সিগার ফুঁকেছেন । কজনের সাথে রুড হয়েছেন , কত অভিনেতাকে চড় মেরেছেন সেটে । কজনের সাথে শয্যায় গেছেন !

মানুষ অবাক । সাধারণতঃ কেউ পরকালে পাড়ি দিলে ভালো ভালো সংবাদ বার হয় । আর উনি তো সবার প্রিয় । মিস পার্ফেক্ট ।

পরে জানা যায় যে উনিই বলে গেছেন - সারাজীবন এত স্তুতি শুনেছেন যে উনি তাতে ক্লান্ত -কারণ কোনো মানুষই পার্ফেক্ট নয় । ওঁরও বহু দোষ আছে । মানুষের তা জানা প্রয়োজন । মৃত্যুর পরে যেন ওকে নিয়ে কেচ্ছা ছাপা হয় ।

নিডলেস টু সে : সি ওয়াজ এক্সেপশনাল । মিস্ট্রি জীবিত থাকাকালীন , আরো বড় রহস্য , কফিনে ।

ডুলুং একটি অদ্ভুত সুন্দর মন্দিরে ঘুরে এসেছে ঐ এলাকায় । সেটা নিয়েও লিখেছে । মন্দিরে কোনো দেব দেবী নেই । পুজিতা জ্ঞান বা উইসডাম ।

নাম প্রজ্ঞাপারমিতা । হিন্দুমন্দির । জায়গাটি দেখার মতন ।

অপরূপ সব পাখি ওখানে জটলা করেছে ।

আর মন্দিরের সব গাছগুলি সাপের ফণার মতন মন্দিরটিকে জাপটে ধরেছে । সব কটি বৃক্ষ ধাবমান কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ঐ মূল মন্দির পানে । আর শাখাপ্রশাখা গুলি যেন এক একটি সর্প ।

জ্ঞান ভূমিতে শেষনাগ নাকি অনন্ত নাগ ?

কে জানে !

গভীর বনে এই উপাসনাস্থল । ডুলুং ওর অকৃত্রিম পরিচিতা মেয়ে রোজমেরীর সাথে যায় ।

ওদের দুজনকেই ছুঁয়ে গেছে এই অসামান্য অরণ্য । পূণ্যভূমি ।

পুরোহিত এক গোরা চামড়া । কেন তা বোঝা গেলো না ।

অরণ্যের নি:স্তব্ধতা মনকে নিয়ে যায় আত্মার উৎসস্থলে । চেতনার গভীরে । আলোর সন্ধানে । পবিত্রতার বারি ও অমরতার নেশায় এখানে পদচালনা ।

ভৌমায়ো , ভূমি সন্তানের ।।

হোটেল মালিক হ্যান্ডসাম পিটের আবার সমাজ সেবার শখ আছে । ওদের শহরের পাহাড়ে , বনপথে- ও নিজেই একটি মেলা বসায় । গ্রামের চাষীরা সব সবজি ফলিয়ে ওখানে বসে , সাজিয়ে নিয়ে । তাদের সঙ্গে ফলন নিয়ে কথা বলা যায় । ওরা বক্তৃতা দেয় নানান সবজি নিয়ে । কতটা ফলন হলো এইবার , কী করে হল । টাটকা ক্ষেতের কীটনাশক বিহীন সবজি মেলে । সেদিন আবার পথচারী ভিখারি ও ভিখারিনীগণ নাটক করে সেখানে , ঐ মেলায় , গান গায় ।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে । বাবা মায়ের হাত ছাড়িয়ে কচিকাঁচার দল ভিড়ে যায় ভিখারীর দলে । ওখানে সবাই মানুষ ।

রোজমেরী একদিন সোনালী বেণী দুলিয়ে এলো । এসে বললো যে পিট একটি আহাম্মক ।

ডুলুং অবাক নেত্রে চাইলে সে বলে যে পিট রাজ্যের সমাজ সেবা করে ও মেলায় যায় যার পরিচালনার ভারও কতকটা তারই কিন্তু একটি মেলা পাশের পাহাড়ে

হয় , সেখানে শত শত ব্যাচেলার ছেলেমেয়েরা যায় মেলার নাম - ---

জনসন ইজ অ্যালোন ।

সেই জনসন ইজ অ্যালোন মেলায় পিটের মতন ব্যাচেলারের যাওয়া উচিৎ কিনা ?

কত রূপসী , হরিণী ওখানে আসে । পিটের কাউকে ভালো লাগতেই পারে । চোখে পড়ার মতন সব মেয়েরা ওখানে আসেন । নিরেট গাধা নাহলে কেউ ওখানে না গিয়ে পারে ? শুধু ফলমূল কন্দ আকড় নিয়ে বেঁচে আছে বেচারা !

রোজমেরীকে জিজ্ঞেস করলো ডুলুং : তুমি কি যাও ? তুমিও তো একা !

মেয়েটি হাসে । তারপর গোলাপী হাতে একটি নীল ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বলে : পিট না গেলে আমি গিয়ে করবো টা কি ?

- তুমি পিটকে খুব ভালোবাসো তাই না ?
- হ্যাঁ , সলজ্জ জবাব , মিঠে উত্তর , সুরেলা তান ।
  পাহাড়ের নৈ:শব্দে ভেসে আসে বেদনার সুর ।
  লোনলিনেস , প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়ার আকুতি ।
  ঝর্ণা যেমন ছুটে চলে নদী পানে সেরকম রোজমেরী বৃক্ষেও আসে ফুল কোনো এক রাজপুরুষের কারণে ।
  কিন্তু সেই ফুল কোনদিন কি দেবতার পায়ে অর্পিত হবার

সুযোগ পাবে ? ঝরে যাবে পাতাঝরার দিনে , হেমন্তে । নিশির হাতছানি ডেকে নেবে নিষ্পাপ ফুলকে কোনো অচেনা গোঠে ।
ভূমধ্যসাগরের সর্পিল ঢেউ, ছুঁতে যে চায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া ।

ডুলুং এর বন্ধু, নতুন সখা গুজরাটের যুবক হেমন গালার বাস এই পাহাড়েই । নদীর ধারে ওর দোকান । দোকানের নাম ফিশার ম্যানস্ বেন্ড । জ্যন্ত ট্রাউট , বাফেলোক্যাটডগ , সিলভেস্টার ইত্যাদি সুস্বাদু মাছ ধরে ধরে ভাজে কিংবা বেক করে । সব নদীতে মেলে । বাফেলোক্যাটডগ মাছটি খেতে আমাদের রুই মাছের মতন । খুবই সুস্বাদু ।
বাঙালী স্টাইলে রান্না করা চলে ।
অবশ্য ও শহর থেকে চিংড়ি আমদানী করে । সেগুলিও রান্না করে দেয় । মানে ভেজে কিংবা বেক করে দেয় । ভালই বিক্রি হয় ওর । দোকানটি খুব বড় । হেমন আদতে কোন জাত ডুলুং জানে না । ওর বাড়ি গুজরাটে । নিজে নিরামিষ খায় কিন্তু ভাজে মাছ ।
ডুলুং ট্রাউট খেলো । পয়সা দেবার আগেই অবশ্য বলেছিলো যে আমি ক্রেডিট কার্ডে পে করবো । হেমন গালা বলে : আমি ক্যাশ নিই ।

ডূলুং বলে : আমার কাছে এত ক্যাশ নেই । আমি তাহলে অন্য আরেকদিন আসবো ।

হেমন জাত ব্যবসাদার । অপরিচিত ক্রেতাকে ফিরিয়ে না দিয়ে বললো : বিনাপয়সায় খেয়ে যান আজ , ভালো লাগলে পরে এসে খেয়ে যাবেন । তখন ক্যাশে দিলেই হবে ।

হেমনের মাথার চুল সামনের দিকে ছাঁটা প্রায় ন্যাড়া । পেছনে লম্বা বেণী করা । রং অর্ধেক সোনালী অর্ধেক নীল আর বাকিটা কালো ।

মুখটা চৌকো । রং মাঝারি ।

মিষ্টি হাসে । হেসে বলে : আমি রান অফ কচের মানুষ । ওখানে রান উৎসব হয় । মহোৎসব । পূর্ণিমার রাতে , চাঁদের আলোতে লোকাল মানুষ ফোক সং , নাচ দেখায় , উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত হয়ে । বহু মানুষ আসেন ওখানে সেইসময় ।

রাতে এক আজব নৃত্যরত আলো দেখা যায় এইসব এলাকায় । রাণ , বন্নী ঘাসবন ও অন্যত্র এই অলৌকিক আলোকে লোকে বলেন : চির বাত্তি ।

বলাবাহুল্য ওগুলি ভৌতিক আলো ।

কেউ হয়ত বলবেন : আলেয়া ।

জলাভূমিতে প্রেতাত্মার নাচ ।

ভূজ নগর থেকে ওর বাসায় যেতে হয় । রিফিউজি সিনেমা ঐ জায়গাকে কেন্দ্র করে । সলমন রুশদি ওঁর নভেলে এই জায়গাকে নিয়ে লিখেছেন ।

বেশ গর্বিত হেমন গালা মনে হল ।

বললো : আমার দিদি ও বোনেরা এখানে সুতোর কারুকার্য করা পোশাক ও অন্যান্য বস্তু তৈরি করতো । আমাদের বড় ব্যবসা ছিলো ।

হেমন গালা বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে আসে । ও এক মুসলিম মেয়েকে শাদি করেছিলো সেইকারণে গৃহহারা হতে হয়েছে ।

মেয়েটি খুবই ভালো , নম্র । নাম কেকি । আগে নাম ছিলো নাজনীন ।

ডুলুং জানতে চাইলো কোনো মৃত্যুর পরোয়ানা ছিলো কিনা !

হেমন হাসে । খুব হাসে । তারপরে মৃদু স্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠে :

ভারতে যত সমস্যা তার ৯০ ভাগই এই জাতপাত , ধর্ম নিয়ে ।

তারপরে আসে কালো সাদা ।

একেবারে শেষে ধনী দরিদ্র ।

আচ্ছা আমরা সব ভুলে একজোট হতে পারিনা ?

হিন্দু আর মুসলমানের ব্লাড কি আলাদা ?

ব্লাড গ্রুপ হয়ত ভিন্ন , তা তো প্রতিটি মানুষেরই নানান ব্লাড গ্রুপ হয় একই জাতে একই বাসায় একই পরিবারে । কিন্তু দুই জাতের দুইরকম এমন শুনেছেন কোথাও ?

আমার ইনার ভয়েস বললো : গালা , এবার এখান থেকে পালা । তাই চলে এলাম ।

এসে তো ভালই করেছি কী বলেন ?

এইদেশে নারী পুরুষ জাত ধর্ম এইসব নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যাথা নেই । আসলে শেকল খুলে আকাশে না উড়লে স্বাধীনতার আনন্দ আস্বাদন করা যায়না ।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গালা থামলো । ওর বাদামী উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ চকচক করছে ।

- তোমার বৌকে দেখবো, ও কোথায় ? ওকে ডাকো । বিয়ে করেছো বলোনি তো !

গালা এবার মেঘের ভেলায় চড়ে বসলো ।

-আমার সেই বৌ কেকি আর নেই । ও সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃতা ।

এখন আমি একা , অনেকদিন । এখানে পার্টনার সন্ধানের মেলা বসে , অন্য পাহাড়ে । জনসন ইজ অ্যালোন নামে । বহুবার ভেবেছি ওখানে যাবো কিন্তু যাওয়া হয়নি । আসলে একটি মেয়েকে ভালোলাগে । সোনালী চুলের মেয়ে রোজমেরী । ওকে মেলায় যেতে দেখিনি কখনো । তাই আমারও যাওয়া হয়নি । ও না গেলে আমি গিয়ে করবো কী ?

ডুলুং লিখেছে গোটা গোটা অক্ষরে : :
চরিত্রগুলি ছড়ানো চারিপাশে । শুধু বড়শিতে গেঁথে নাও ।
জীবনের পদস্পর্শে ধরণী মতোয়ারা । হেমন গালা , পিট, রোজমেরী এদের চারণভূমি থেকে নিজ উদ্দেশ্য খুঁজে নিয়ে আবার পথচলা শুরু করলাম ।

রাত্রির রাত্রি এলো । ডিনার খেয়ে রাতপোশাক পরে ডুব দিলো ঘুমে । পরের দিন প্রত্যুষে যেতে হবে কাজে ।
কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো । বসলো ডাইরি নিয়ে---আলতো মোমের বিভায় -----মাঝে মাঝেই বসে । মনকে শক্ত করতে হয় তার আগে , এইসব গল্প উপন্যাসে পড়া চলে কিন্তু নিজের একজন কিংবা কাছের মানুষের ব্যাথা বেদনা জানা বেশ কষ্টসাধ্য ।

এখন বাইরে চাঁদের আলো । পাহাড় নিশ্চুপ, ময়াল সাপের মতন শুয়ে আছে ধরিত্রী জুড়ে যেন । ওর অতিথিনিবাসের কিছু দূরে এই পাহাড় । ঢেউ খেলানো , মায়া ছড়ানো । রাতপাখির ডাক আর দূরের বনে কোনো অচেনা পশুর হুঙ্কার শোনা যায় ।

সামনের বাড়িতে আছেন ডেভিড । ডেভিড একটি হলিডে কোম্পানিতে এজেন্টের কাজ করে । সাইড বিজনেস আছে । বিয়ের আসরে গিয়ে মিউজিক বাজানো । এখানে বিয়ে সহজে হয়না তাই অন্য চাকরি করতে হয় বিলস্ পে করার জন্যে । নাহলে হলিডে কোম্পানির এজেন্টের কাজ ওর তেমন প্রিয় নয় ।

ক্লায়েন্ট ধরে দিলে মোটা কমিশন । নাহলে নামমাত্র মাইনে ।

ডেভিড বা ডেভ খুব মিশুকে । রাত্রি শুক্রবার রাতে এই পাহাড়ে এসেছে । নাম মাউন্ট ল্যাঙ্গার । এসেছে ডুলুং এর ডাইরিটি উপভোগ করার জন্যে । পাহাড়ে বসে পাহাড়ের উপাখ্যান পড়বে সে ।

বিকেলে পড়ন্ত আলোয় আলাপ করেছেন ডেভ । ওর পত্নী ডেবোরাহ্ খুবই হাসিখুশি গৃহিনী । আগে কাজ করতেন রিয়েল এস্টেট ফার্মে । এখন বাড়িতেই আছেন । তিন বিচ্ছু সন্তানকে প্রতিপালনের আশায় ।

ওদের বাড়িতে রাতে খেয়েছে । এত স্বল্প পরিচয়ে বাড়িতে ডেকে খাওয়ানো ! বিরাট ঘরগুলি । ডেভের বাবার নির্মিত বাড়ি ।

১০০ বছরের পুরনো কার্পেট । পুরু ধুলো , ধূলোর গন্ধ ।

ভাঙা পিয়ানো । অচল ভিক্টোরিয়ান ঘড়ি । অজস্র অর্কিডের সমারোহ ।

ডেভের মা রাশিয়ান নাম লাডা, ওরা বলে লাদা । বাবা বৃটিশ ।

কোনো কারণে ওদের কোনো এক পূর্বপুরুষকে এখানে চালান করা হয়

আসামী হিসেবে । অপরাধ সামান্য পাউরুটি চুরি । শীতের সময় অর্ধভুক্ত ঐ মানুষ কোনো দোকান থেকে একটি আস্ত পাউরুটি তুলে নিয়ে পালাতে যান । কিছুদিন আগেই পড়া বরফে ঢাকা চরাচর । মালিক পিছুধাওয়া করেন । তাকে বরফের ওপরে ঠেলে ফেলে পালান পাউরুটি চোর । দোকানি আহত । তাই বুঝি অপরাধের মাত্রাও ভারী । সেই সুত্রেই এখানে পদার্পণ । তারপর এখানেই জন্ম কর্ম সব ।

ডেভিড অনুসন্ধানী ।

-তুমি এখানে কি মনে করে ? সুদূর ইন্ডিয়া থেকে ?

- আমি কাজের সুত্রে , রাত্রি অল্প কথায় সারে ।

আজ আর কথা বলতে ভালোলাগছে না । ডেভের পরিবারের সবাই ওকে আপন করে নিয়েছে একদিনে । এই মূহুর্তটি ভীষণ ভাবে উপভোগ করতে চায় সে । একটু নীরবতার সন্ধানে সে আজ মূক কিন্তু বধির নয় !

পরের দিন স্বর্ণালী ভোরে কফি পান করতে করতে আলাপ হল এক বঙ্গ ললনার সাথে । এই পাহাড়ে তার বাস । নামটিও বেশ । শ্রীজাতা । শ্রীজাতা উসগাঁওকর । ঝর্ণার পাশে বাড়ি । সবুজ সবুজ বাগানে ঘেরা ।

শুকনো পাতার মচমচানি পেরিয়ে সেই অনাবিল পুরী ।

মারাঠা প্রদেশের এক যুবকের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে এখানে আসে ।

ছেলেটি সুচাকুরে । পড়াশোনায় ভালো মাথা ছিলো ।

সে এখানে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করতো । ভালো মাইনে । স্বভাব চরিত্রও মন্দ নয় । শ্রীজাতাকে শ্রী বলে সম্বোধন করতো ।

ছেলেটি যৌবনে সাধু হয়ে যেতে চেয়েছিলো।

শিরডিতে অনেকদিন ছিলো সে । দাঁড়ি গোঁফ রেখে এলাহি ব্যাপার ।

গেরুয়া পরণে ।

ওর মা কান্নাকাটি করতে শুরু করেন : আমার ছেলেটা সাধু হয়ে গেলো !

বাবা বিরক্ত ওর ওপরে ।

শেষে পাত্রীস্থ করেন । ছেলেকে জোর করে ধরে এনে বিয়ের ব্যবস্থা করেন । ছেলে যার নাম রাজেশ সে মায়ের শারীরিক অবস্থার কথা শুনে

ঘরে ফেরে সেইসময় কায়দা করে ওকে পিঁড়িতে বসানোর প্ল্যান করেন ওর বাবা । কিন্তু সেগুড়ে বালি ।

ছেলে আত্মহত্যা করতে যায় এই ছলনার কথা জেনে ।

রক্ষা কর্ত্রী ওর স্ত্রী । এই মেয়ে , নীল পাহাড়ের মেয়ে শ্রীজাতা ।

মেয়েটি বহুদিন যাবৎ মারাঠা প্রদেশে । তাই হাফ মারাঠী । উসগাঁওকর ওর বিয়ের পদবী । আগে ছিলো সিংহরায় ।

বাবা এক জমিদার বাড়ির ছেলে । দক্ষিণ বঙ্গের জমিদার । পরে পশ্চিমে চলে যান । শ্রীজাতা খুবই মিশুকে । রাত্রিকে অনেক গল্প বললো ।

ওর স্বামীর সাথে ওর বনিবনা ছিলোনা । স্বামী ওকে ত্যাগ করেন নি । কিন্তু সুদূর এই দেশে এসে ওর সাথে সেরকম যোগাযোগ রাখেন নি ।

চিঠির জবাব আসতো না । এলেও মর্সকোডে কয়েক লাইনের মতন ।

- আমি ভালো আছি , তুমি ভালো থেকো । বাবা মা কে দেখো ।

ব্যস্ , চিঠি শেষ । পায়ে পায়ে পোস্ট বক্সের দিকে গিয়ে এই কয়েক লাইন কুড়ানো । খুব দু:খ হত । হৃদয়ের একটি পাশ ভেঙে পড়েছিলো ।

মনে মনে ভাবতো , কী হল ?

বান্ধবীরা বলতো : দেখ হয়ত মেমের গলায় মালা দিয়েছে । তোর মতন প্রোষিতভর্তৃকা এবার একলা নিজ নিকেতনে থাকবে ।

সন্ধ্যাবেলায় সূর্য ডোবার পরে রাতের রজনীগন্ধা নিয়ে ভাসিয়ে দিতো মেয়েটি জলে । ভেবেছিলো আলো আর ফুটবে না । শুধু আঁধার । ঘন তমসা ।
কিন্তু গাঢ় আঁধারের পরেই আসে ভোর । শীতের শুস্কতার পরেই আসে রঙের হোলি । বসন্ত উৎসব ।
ফুল ফুল আর ফুল , শুধু ফুল ।
শুধু দু হাত ভরে পেলো ফুল ।

ছেলেটি পরবাসে অসুস্থ হল । গভীর অসুখ । চাকরি গেলো তাই ।
তখন স্ত্রী ওকে চাকরি করে খাওয়ায় । একটি নার্ভের অসুখ হওয়ায় একদিক অসাড় হয়ে পড়ে । তবুও শ্রীজাতা ত্যাগ করেনি ।
ভোরের শেফালি দিয়ে সাজিয়েছিলো ওকে ।
খুবই ভালোবাসতো যে ! ছেলেটি ওকে সসম্মানে নিজ কোটরে রাখে ।
পক্ষীশাবকও এলো একদিন ঘরে আলো করে ।
চরাচর শুদ্ধ হল । বাতি জ্বলে উঠলো কোটি কোটি , এক নিভৃত কোটরে । মনের আকাশে ডানা মেললো শত শত শ্বেতকপোত-কপোতী ।
যশোবর্ধন সেই সন্তানের নাম ।
--কেমন রাজা রাজা শোনায় , তাই না ?
হেসে ফেললো শ্রী ।

- হ্যাঁ , তা একটু শোনায় বৈকি !
- তোমার ছেলে এখন কোথায় ? কোথা যশোবর্ধনে ব্যস্ত সে ?

  হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো শ্রী, এই প্রথম । সন্তান হারানোর শোকে ।

----ও আমেরিকায় ছিলো । মাত্র ১৯ বছর বয়সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে ।

শ্রীজাতার স্বামী রাজেশ আগেই মারা যান । সেই নার্ভের অসুখে । কোটিতে গুটি লোকের হয় যেই অসুখ সেই রোগ কেড়ে নিলো শ্রীজাতার প্রাণপুরুষ । পরে ছেলেও গেলো । তবে ওর মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা । বিষাদ রোগের কবলে পড়ে সেও ধরিত্রীর মায়া কাটালো ।

- একটা স্বপ্ন ওর সফল হয়েছে । ও আমেরিকায় গিয়ে ব্লু-গ্রাস মিউজিক করতে চেয়েছিলো । সেই স্বপ্ন ওর সফল হয়েছে ।

  আমেরিকায় ব্লু গ্রাস মিউজিক গ্রুপে ও যোগ দেয় । খুবই খুশি ছিলো ।

  ভালো বন্ধুর গ্রুপ ছিলো । একটি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয় । ব্রেন্ডা স্মল্টন । মেয়েটি বহু পুরুষে যায় । আমার ছেলে বেছে নেয় আত্মহননের পথ ।

  বড় অভিমানী আমার ছেলে ।

ব্রেন্ডা ওর সামনেই নাকি অন্যপুরুষের সাথে ফিজিক্যাল হত ।

লিখে রেখে গেছে চিঠিতে । নিজেই লিখে নিজেকেই পোস্ট করতো । মনের সব জ্বালা যন্ত্রণা মেটাতো এইভাবে । আমার ছেলে হয়ত বিরাট কেউ নয় তবে মানুষ হিসেবে একেবারে প্রথম সারিতে আসে ।

দু:স্থ মানুষের সে বড় ভরসা ছিলো । নিজের পকেটে এক ডলারও থাকলে তা দিয়ে দিতো অভাগাদের । তাদের প্রয়োজনে ।

কান্ট্রি মিউজিক ব্লু গ্রাস । ফোক সং । তা লিখতো আমার ছেলে । সাধারণ মানুষের ব্যাথা বেদনা লিপিবদ্ধ করতো । বলতো : শুধু গান লিখে তা গাইলেই হবেনা । ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে ।

কোথার থেকে এক হোমলেস মানুষকে এনে তুলেছিলো নিজ গৃহে ।

শেষসময়ে মানে ফিউনেরালের আসরে সেই বুড়ো উন্মাদের মতন কেঁদেছিলো । আমি ওর শ্রাদ্ধ করিনি । অনেক অভুক্তকে সেদিন খাইয়েছি । ওর এরকমই ইচ্ছা ছিলো ।

ব্লু গ্রাস মিউজিক যারা করে তারা নাকি এরকমই হয় , ছেলে বলতো ।

অঝোরে কাঁদছে শ্রীজাতা । রাজেশ ওকে এখানে নিয়ে আসে , পরে ।

তারপর একদিন সে মারা যায় । ছেলেকে বুকে নিয়ে বেঁচে ছিলো ।

সেও গেলো ।

শ্রীজাতা এখন মুখাভিনয় করে । লোকের দু:খ বেদনাকে মুখাভিনয়ের মাধ্যমে সে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেবার ব্রত নিয়েছে ।

ভালই পারে । নাম হয়েছে বেশ । এখন অন্য রাজ্য থেকে ডাক আসে ।

মুখাভিনেত্রী শ্রীজাতা ,রাত্রিকেও করে দেখালো কিছু কিছু ।

■ মন্দ নয় , বলে রাত্রি ।

- হ্যাঁ আমি পারি তবে আমার ছেলের মতন নয় , মাই গ্রাসেস আর লাইট গ্রিন, নট ব্লু ।

ওর সঙ্গী এখন অনেক সারমেয় । ছেলে কুকুরপ্রেমী ছিলো ।

হয়ত তাই । রাত্রি জানেনা । জানতে চায়নি ।

সব প্রশ্নের উত্তর জানতে নেই । জানার প্রয়োজন নেই । থাকনা রহস্য । থাকনা কুয়াশা , শ্রীকে ঘিরে । অনেক তো জেনেছে ।

শ্রীর কুকুরেরা হেল্প ডগ । ওরা এই ফিল্ডে নতুন কুকুর । মানসিক অসুস্থতা যাদের আছে তাদের জন্যে এই বিশেষ কুকুর । ওরা রুগীদের সাথে বসবাস করে ও তাদের বিভিন্ন সময় সাহায্য করে ।

শ্রীর সমস্যা ওর হ্যালুসিনেশান । মাঝে মাঝে ওর হ্যালুসিনেশান হয় ।

মনের ভুল । চোখের ভুল । কিন্তু সে বোঝেনা । সেটাই ওর অসুস্থতা ।

সারমেয় সাহায্যের হাত বাড়ায় তখন ।

লোকে যদিও জানেনা যে এরা সাইকিয়াট্রিক ডগ । অ্যাসিস্ট করার জন্য আছে । ও কাউকে বলেনি । সোসাল স্টিগমার ভয়ে ।

যদিও ওর ছেলে ছিলো ডিপ্রেসড্ । কিন্তু নিজের মনোরোগ লোক সমক্ষে স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করে ।

--আমি পাগল নই । আমাকে পাগল বলো না । আমি মুখাভিনয় করি । আমি কাজ করে খাই । শুধু মাঝে মাঝে দৃষ্টি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কারণে আমি পথভ্রষ্ট হই !

করুণ দৃষ্টি ওর চোখ জোড়ায় !

রাত্রি মনে করে ওর কাজের কথা । মুখে কিছু বলে না যদিও ।

হাসে , হেসে অভ্যর্থনা জানায় ।

দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে শ্রী কে । শ্রীজাতা উসগাঁওকর ।
রাত্রির আজ মিতালি হল ওর সাথে ।
ওর সাথে সই পাতালো । বললো : এসো !

এই পাহাড়ের একপাশে আগে ছিলো উপজাতি । ওরা তাঁবু গেড়ে বাস করতো বহুকাল । তারপরে সেই জায়গা ছেড়ে যাবার আগে ওকে শস্য শ্যামলা করে যেতো । ঘাস গজিয়ে দিতো শুস্কধরায় , পার্বত্য এলাকায় । তারপর কোনো এক মধুর সন্ধ্যায় পাড়ি দিতো অচেনায় । এই উপজাতির কল্যাণে পাহাড়ে সবুজের বাণ ডেকেছে ।
হয়েছে বসতি । ফুলের বাগান । রডোডেনড্রন বাগিচা । আগে নাকি এখানে এত সবুজ ছিলো না । শুধু ঝুলন্ত পাথর ও খরা ।
নদীও তেমন বড় নয় ।
কিছু উপজাতির মানুষ এখানে রয়ে গেছেন । স্থানটি অনুকূল হওয়ায় । ওরা আর যাননি অন্যত্র । দলের সাথে ।
এখানকার পাকা বাসিন্দা এখন । কিন্তু সরকার থেকে ওদের সন্তানকে কেড়ে নেওয়া হয় ।

তাদের সুসভ্য ও ভদ্র করার প্রয়াসে সাদা চামড়া ও গীর্জার অধীনে রাখা হয় । বাবা মায়েরা শঙ্কিত ।
অনেক বাবা মা বাচ্চা হবার আগে পালিয়ে যায় । অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে ।
কিছু মা আবার তাদের সন্তানকে অরণ্যের গহীনে রেখে আসে । এরকম কয়েকজন বাচ্চা ওখানে ছিলো বছর ১৫ । ওরা পুরো জংলী হয়ে উঠেছে । কথা বলতে পারেনা । মুখ দিয়ে আওয়াজ করে কেবল । দুজন একবার লোকালয়ে চলে আসে । ওদের মায়েরা ওদের চিনতে সক্ষম হয় চেহারার মিলের কারণে ।কিন্তু ওরা অরণ্যচারী ।
নিজ ভুবনের সম্রাট । ওরা আবার পালিয়ে যায় । একজনকে খাঁচায় রাখা হয়েছিলো । সেও পালায় । খাঁচা ভেঙে । গায়ে ওদের বেজায় জোর । জঙ্গলের মানুষ তো । সাচ্চা দিল আর শক্তপোক্ত দেহ ।

--কুটুম্বা ও কুটুম্বা , হাঁকতে হাঁকতে ছুটে এলো একজন উপজাতি রমণী ।
পরণে রঙীন খাটো পোশাক ।
কুটুম্বা ও ওরাং ওর দুই সন্তান । ও সরকারকে দেয়নি । জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিলো । কিন্তু নিয়মিত ওদের পরিচর্যা করতো ।

একবার পুলিশ ওদের নিতে এলে ওরা নদী পেরিয়ে ঘন বনে গা ঢাকা দেয় । হাত পা ছড়ে যায় । শেষে পাগলা হাতি বার হয় ।

বৃংহনের চোটে পুলিশ পালায় । ওরা তিনদিন একটি বিরাট বৃক্ষের কোটরে লুকিয়ে ছিলো । অভুক্ত নয় কারণ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলো শুকনো খাবার ও জল ।

এখান ফিরে এসেছে । তবে পুলিশের গন্ধ পেলেই পালায় ।

সেই ঘন বনে । রক্ষক আবার হয়ত কোনো পাগলা হাতি ।

ওরা সন্তান উৎপাদনের জন্যে ফ্রগ ড্যান্স বা মন্ডুক নৃত্য করে ।

বিরাট একটি ড্রাম ও হাড়ের বাঁশরি নিয়ে এই নাচ হয় ।

হাড়গুলি মৃত পশুর । বেশ কয়েকজন মিলে সঙ্গত করে ।

নানান তান , সুরের ঝঙ্কার । আকাশ বাতাস মুখরিত ।

কিন্তু সন্তান হয় কি ?

■ হ্যাঁ হয় । বলে কুটুম্বার মা , ওরাং এর মা জিন্দিভা ।

হয় হয় বিশ্বাস রাখতে হয় । মানুষে বিশ্বাস , পশুতে বিশ্বাস । গাছে বিশ্বাস । বৃষ্টিতে বিশ্বাস ।

প্রাকৃত মা জিন্দিভা । প্রকৃতির কোলে সন্তানদের বিছিয়ে রাখে ।

বর্ষায় বন্যায় সব ভেসে যায় । ওরা উপত্যকার মানুষ তাই ওদের বাস সমতলে । নদীর স্রোতে সব ভেসে যায় । যদিও নদী তেমন বড় নয় তবুও । বেশ জল । জলাভূমি । কাদা , সিক্ত ধরা ।

এখানে ভালো বর্ষা হয় । ওরা বর্শা নিয়ে শিকারে যায়না আর । সেইসময় ওরা গাছ বাড়িতে বাস করে । সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় ওপরে । কাঠ ও কঞ্চি দ্বারা নির্মিত ঘরগুলি ।

পাতায় ছাওয়া । উঁচু দালান । গাছ দালান । হাঁটু সমান কাপড়ে মেয়ে বৌয়েরা ওখানে ঘাঁটি গাড়ে কয়েক মাস । জল কমে গেলে নেমে আসে । আবার উজান বেয়ে চলা । সমতলে বাস ।

পোকা, মাছ , পাখি , ব্যাং , চড়াই ভাজা ও পিঁপড়ে খেয়ে চলা । অনেকে টিকটিকিও খায় । সাপের মাংস ও খোলস ।

এইভাবেই কাটে জিন্দিভার দিন , সময় , হেমন্ত ।

শীতকালে মাচার নিচে আগুন জ্বেলে দিন গুজরান , অর্ধ নগ্ন মানুষ পাতা পরে , নারীরা হালকা শিকার করে , ব্যাং , পোকা , পাতা খোঁজে আর ছেলেরা বড়

জন্তু ও মাছ ধরে । এই ভুবনে । সবুজ আঁধারে । মখমলের শ্যামল দুনিয়ায় ।

ওদের দলের অনেক মানুষ জুয়ায় হারিয়ে যায় । জীবন জুয়ায় নয় , জুয়া খেলে । মদ ও জুয়া ওদের খেয়ে ফেলে ।

জুয়ার নেশায় হারিয়ে যায় ধন মন মান ।

যে কয় ঘর বাসিন্দা তাদের ভেতরে বেশির ভাগই এই কুপথের পথিক । তাই বুঝি শ্রীজাতা ওর সঙ্গীদের নিয়ে ওখানে মুখাভিনয় করে । জুয়ার প্রভাবে মানুষের জীবনে কত ক্ষতি হয় সেইসব দেখায় অভিনয় করে করে । একাঙ্ক নাটক ।

কিম রূপ খিরাং খিরাং একটি নাটকের নাম ।

শ্রীজাতা ওদের ভাষা শিখে নিয়েছে । মিশে গেছে আদিম মানুবের মাঝে । পুত্রশোকে কাহিল হলেও নতুন বন্ধন খুঁজে নিতে পেরেছে ।

====

দুইহাত বাড়িয়ে ডেকেছিলো ক্রেগ , ক্রেগ সিং ।

ক্রেগের সাথে দেখা নির্জন পাহাড়তলিতে । সুবজ বনভূমে । পাহাড়ের গন্ধ নাকে চোখে । শ্যাওলা ধরা পাইন বার্চ বন । পাখির কলতান ।

ক্রেগ যে ভারতীয় তা বুঝলেও সে যে আদতে বাঙালি তা বুঝতে পারেনি রাত্রি । গায়ের রং দেখে দেশি মনে হয়েছিলো ।

ক্রেগ সিং আসলে দেবদুলাল ঘোষ । বাড়ি দক্ষিণ বঙ্গে ।
রাজনৈতিক কারণে দেশ ছাড়া ।
বর্ডার ক্রস করে পালিয়ে যায় বাংলাদেশ , সেখান থেকে এই দেশে চলে আসা । সিঙ্গাপুরের দিক থেকে নৌকো করে এখানে আসে নানান বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ।
নৌকোগুলি মাঝে মাঝে ডুবেও যায় , মাঝসমুদ্রে ।
কোনো টয়লেট নেই । যেখানে খাওয়া সেখানেই শোয়া । সেখানেই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া । এইভাবেই চলতে চলতে প্রাণ হাতে নিয়ে ক্রেগ সিং এইদেশে ।
মেধাবী ছিলো ভারতে ।
ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ।
একটি গাছের পুরনো গুঁড়িতে বসলো দোঁহে । এখানে বনবাসী গ্রামে পুরনো ড্রাম, মাচা এইসব বসার জায়গা হিসেবে রাখা হয় ।
ক্রেগ এখানে ওদের কারিগরী বিদ্যা শেখায় । ওরা খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করে ওকে ।
একটি গাছের পরিত্যক্ত গুঁড়িতে বসে ওরা গল্পে মেতে ওঠে ।
নীলাম্বরী রাত্রি , কৃষ্ণ কালো ক্রেগ । বসনে ভুষণে ।

অরণ্য নিজেকে মেলে ধরেছে এখানে । অচেনা পোকার ডাক , জলের শব্দ ।

ক্রেগের এখানে বিয়ে হয় এক পাঞ্জাবী ললনা শিবাঙ্গীর সাথে ।

শিবাঙ্গী শাম্বোষ্ঠী নয় কমলালেবুর মতন ঠোঁট , গোলাপী আভা , নিপুন নাক চোখ । বাসা আদতে লুধিয়ানার দিকে । ওর বাবা ওখানে বেশ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার ।

এখানে আলাপ হয় । মেয়েটি মুগ্ধ হয় ক্রেগের বৈদগ্ধে । দুজনে আলাপ বাড়িয়ে প্রলাপে নিয়ে যায় । একসাথে থাকা শুরু করে ।

■ শিবাঙ্গী আমার ফার্স্ট ফ্লেম , বললে বিশ্বাস করবে ?

-কেন করবো না , সংক্ষিপ্ত উত্তর রাত্রির ।

অরণ্য মাধুরী ঝরায় । মাধবী মূহুর্ত । মনের কোণে , আনমনে বলে ক্রেগ----ওকে আমি খুবই ভালোবাসতাম , ভালোবাসা শুধু দেহে নয় আত্মায় ছড়িয়ে গিয়েছিলো । ম্যাডলি ইন লাভ উইথ হার ।

ওর স্মার্ট থিঙ্কিং আমাকে আকর্ষণ করতো । ও বলতো যে মেয়েদের লোকে নিচু চোখে দেখে । ওরা দৈহিকভাবে উইক বলে ওদের হেয় করে । ওরা নাকি পলিটিক্স করে নিজেদের দিকে তরী ভেড়ায় । কিন্তু শিবি এগুলি মানে না । ও পলিটিক্স করে না । ও স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ডিপ্লোম্যাসি তে বিশ্বাসী । চাণক্যের নীতি ।

Chanakya said that *"A man must not be too straightforward because the trees standing straight in forest are chopped out first"*

ওকে আমার খুবই ভালোলাগতো । কিন্তু ওর সমস্ত নীতি ধূলায় মিশে গেলো যেদিন জানতে পারলাম আমরা যে আমার একটি কিডনি নেই জন্ম থেকেই । কিছু দৈহিক অসুবিধে হওয়াতে আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই । তখন জানতে পারি যে আমার একটি কিডনি নেই । আমি একটি কিডনির সাহায্যে জীবিত ।

ডাক্তারের চেম্বার থেকেই ওর মুখ থমথমে । তারপর থেকে ও আমাকে খুব অপমান করতো । যেন আমি জেনে শুনে ওর জীবনে এই বিপত্তি ডেকে এনেছি । যেন জানতাম যে আমি একটি কিডনিহীন তবুও ওকে ফ্যাসাদে ফেলার আছিলায় এই পথ বেছে নিয়েছি । কিসের রাগ আমার ওর ওপরে ? কোন জন্মের প্রতিশোধ তুলছি আমি ?

এই প্রশ্নগুলি ঘুরে ফিরে বহুবার এসেছে আমাদের মধ্যে । ও খুব ঝগড়া করতো । আমাকে মারতো । আমার শার্ট ছিঁড়ে দেয় , আমাকে লাঠি পেটাও করে । কারণ আমার জন্ম থেকে একটি কিডনি নেই । আমি তো নিজেই জানতাম না ।

যদি আমার ডায়বেটিস হয় পরে তখন কি হবে ? এইভেবে ও রেগে যেতো ।শেষদিকে একসাথে রাত্রি কাটানো অসহ্য লাগতো । কথা কম , শুধু এক ছাদের নিচে থাকা ।
অবশেষে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ।

রাত্রির চোখের দিকে চাইলো ক্রেগ সিং ওরফে দেবদুলাল ।

দেবদুলাল ঘোষ । বনচরদের কারিগরী বিদ্যায় রপ্ত করার ব্রত নিয়েছে অবশ্যই সরকারের অনুমতি নিয়ে ।
এখন এখানে একটি ছোট শহরে বাস করে । আগে সেটি গ্রাম ছিলো । এখন ছোট শহরের আখ্যা পেয়েছে কতকটা ক্রেগের কারিকুরিতেই ।
মাত্র ২১জন মিলে ঐ শহর চালায় । কাছেই আছে পুরাতন ঘরবাড়ি । বহুযুগ আগের । এখন সেগুলি সংস্কার করে মিউজিয়াম করা হয়েছে কিংবা টুরিস্ট স্পট । কিছু লাইব্রেরি হয়েছে । অথেনটিক সব পুঁথি নিয়ে ।
ক্রেগ ঐ গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করার ব্রতে ব্রতী হয় ।সফল ও হয়েছে সে । তাই এখন ঐ গ্রাম ওরফে শহরের নাম ক্রেগ ক্লিফ ।
অদূরেই আছে এক ক্লিফ, সবুজ বনানীর হাতছানি ।
তাই পর্যটনের কেন্দ্র হয়েছে এই স্থান । লোকে খুব যায় । ক্রেগের সাথেও দেখা করে আসে ।
ক্রেগ সিং ওরফে দেবদুলাল । তা দেবেরই দুলাল বটে ।

ক্রেগের পার্টনার শিবাঙ্গী বা শিবি শেষদিকে নাকি পুলিশকে ফোন করে বলতো : প্লিজ সেন্ড সামওয়ান হিয়ার আই নীড সেক্স ।
চীৎকার করতো । জিনিসপত্র ভাঙতো । ক্রেগ সঙ্গ দিতে রাজি ছিলো তবুও খুব চীৎকার করে করে বলতো : আই নীড সেক্স , আই নীড সেক্স রাইট নাও ।
ক্রেগ খুব মোটা হয়ে গেছে বিয়ার খেয়ে খেয়ে । সঙ্গিনী পালিয়েছে ।
ভারতের একটি মিষ্টি ভাষায় বলা যায় : শিবাঙ্গী ভাগল্‌বা ।

পৃথুল ক্রেগ এখন লোককে দেখলেই চওড়া মুখ করে হাসে ।
সে যেই হোক না কেন , চেনা অচেনা ।
ওর লজিক হল : আমি এত মোটা যে লোকে আমায় দেখে হাসে । তাই আমি আগেই হেসে দিই । তারপর সে যখন হাসে তখন মনে হয় পাল্টা
হাসি দিচ্ছে । আমার ওপরে মানসিক চাপটা কম পড়ে ।

তাজ্জব হয় রাত্রি । এরকম অদ্ভুত যুক্তি আগে শোনেনি ।

ক্রেগের বেশ দু তিনজন বন্ধুকে নাকি ওদের ভারতের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে প্রতিপক্ষ । কারণ ওরা সাক্সেসফুল চিকিৎসক ছিলো ।

---ঈর্ষায় । স্রেফ হিংসায় , বলে মৃদু হাসে ক্রেগ ।

আরো বলে : আমি তাই আমার স্ট্রেনথ্ বাড়াতে রাজনীতি জয়েন করি ।

পার্টির হয়ে কাজ করতাম । অনেস্ট ছিলাম । টাকা এদিক ওদিক করা কিংবা ভুল নীতিকে সঠিক বলে চালিয়ে লোকের চক্ষু:শূল হওয়া কোনোটাই আমার হিসেবের খাতায় নেই ।

কিন্তু কিছু দলের লোক আমার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করে ও আমাকে ফাঁসিয়ে দেয় । তখন দেশ ত্যাগ করতে হয় ।

ক্রেগের মুখে করুণ অভিব্যাক্তি । আকাশ গাঢ় নীল , সন্ধ্যা হব হব ।

বনজ পাখির চারণভূমি এই চরাচর । তারা ঘরে ফিরছে । ফিরতি পাখির গান একটু নরম ।

ডানা থেকে খসে পড়লো পালক । কুড়িয়ে নিলো বসুমতী রাত্রি । খোঁপায় গুঁজলো । রাত্রি এলো খোঁপা করে । চুলে ফুলেল তেল লাগায় । মিঠে সুবাস বার হয় । চারিদিক আবেশে ভরে ওঠে ।

যখন কাছে নেই তখনও মনে রয়ে যায় ।

রাত্রির এক বন্ধু আছে । সে নারী । নাম ক্লো । ক্লো লিন ।

মূল ধারা চৈনিক ।

সুদূর চীন থেকে ওর বাবা মা এখানে এসে ঘাঁটি গাড়েন । তা সে বহুযুগ আগের কথা । বাবা ছিলেন চীনা শ্রমিক । ক্লো নিজের নাম বদলে নেয় । এখানে অনেক চীনারা নেয় । ওদের আজব নাম সাহেবরা উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়ত তাই । ক্লো এখন বুচার । মেয়ে কসাই । মাংস কাটে । নির্মম হাতে । সেই ক্লো-ই রাতে বাড়ি ফিরে তিন সন্তানের স্নেহময়ী জননী ।

ক্লো লিন । একটি বাচ্চার নাম ওর ফ্লিন অন্য দুজন মালিয়া ও সোনিয়া ।

ক্লোয়ের স্বামী লরি চালতো । এখন ওর সাথে থাকেনা ।

ক্লো কসাই হলেও বেশ স্বচ্ছল । বড় দোকান চালায় । ফ্লেশ ফুড নাম দোকানের । বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে ওখানে বসে মাংস কাটা দেখে ।

কচি কচি শিশু সব । মায়ের কর্ম কান্ডের সাক্ষী ।

একবার আইনি ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছিলো ওরা ।

মাংস তো সব নানান রকম । বিফ, গোট, ল্যাম্ব, ক্যাঙ্যারু ।

কাটার পরে হয়ত মিশে যায় । কোনো কোনো কণা , ছোট টুকরো । চলে যায় চালান হয়ে অন্য ব্যবসায় , রেস্তোরাঁয় ।

ক্রেতারা মাংস খেতে গিয়ে দুই ধরণের মাংস দেখে কেস করে । বিদেশে কোর্ট কেস খুবই কমন ।
ক্লো বেচারিকে খুব ভুগতে হয় ।

স্বামী তো কেটে পড়েছে । একা হাতে সব সামলায় সে । অবশ্য কিছু সাহায্য আসে বোন ফ্যান্ডেল এর কল্যাণে । ফ্যান্ডি বলে আদর করে ।
সেই ফ্যান্ডি আনে আনন্দের জোয়ার ওর শুকনো মুখে । কোর্ট কেসে ওরা জেতে ।
ফ্যান্ডি খুবই করিৎকর্মা । একা একটি বিশাল প্রপার্টি চালায় । ল্যাভেন্ডার ক্ষেত । বেগুনি ফুলে ছেয়ে গেছে ভুবন ।
ওরে ভাই বেগুনি লেগেছে বনে বনে ,
হয়ত বোনে বোনেও !
আশ্রয় খুঁজে ফেরে এক বোন অন্য বোনের আঁচলে । মায়ের আঁচলের মতন । এক বোন কসাই অন্যজন ফুলের কারবারি ।

চাঁদনি রাতে দুই বোন বারান্দায় বসে মাটির ভাঁড়ে করে চা পানে মত্ত । এই ভাঁড় এসেছে কলকাতা থেকে । এনেছে ফ্যান্ডির ফ্রেন্ড গ্রেটা ।

গ্রেটার আসল নাম গীতা । ও বাঙালী । কলকাতার মেয়ে ।

বাইরে নিঝুম রাত, ঝিঁ ঝিঁর খেয়ালি গান আর গাড়ি যাবার হুশ হুশ শব্দ ।

বারান্দায় এসে লুটাচ্ছে হালকা মায়াবী আলো ।

দুই বোন গল্পে ডুবে যায় । চুলের কিছু অংশ এসে পড়েছে ক্লোয়ের কপালে । নীলাভ ।

গীতা এখানে থাকে ওর দুই সন্তানকে নিয়ে । গীতার স্বামী সাহেব ।

দুজনে একটি সাবান দিয়ে তৈরি মূর্তির কারখানা চালায় । নানান সাবান দিয়ে ওরা সুন্দর সুন্দর কলা সৃষ্টি করে ।

এছাড়া ওখানে বালির কাজও হয় ।

বালির ভাস্কর্য । সমুদ্রের কিনারায় একটি বড় জায়গা নিয়ে ওরা বালির মূর্তি বানায় । কম্পিটিশান হয় । লোকে দেখে । অন্যরাও তৈরি করে ওখানে । বালি দিয়ে একটি শহর বানিয়েছিলো ওরা । এমনভাবে সিক্ত বালিগুলি জমায় , মনে হয় যেন সিমেন্ট ।

এই আশ্চর্য সুন্দর দম্পতি ওদের সন্তানদের স্কুলে পড়ায় না । নিজেরা পড়ায় । এবং দুজনেই মেধাবী । ওরা এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে ।

প্রাথমিক শিক্ষার পরে ঐ বিশাল ভাস্কর্যের কর্মকান্ড ওরা হাতে তুলে নেবে ।

আলোর পাখি ওরা , আলোয় রাখে ওদের বাবা ও মা । গায়ে আঁধারের স্ফুলিঙ্গ লাগতে দেয় না । কারণ আজিকার দুনিয়ায় বড় কালো , নির্মম । উজ্জ্বল পায়রা নেই ।

এই অদ্ভুত যুক্তি শুনে অবাক হয় ক্লো ।

--- আজকের জগতে সবাই খারাপ ? প্রলয় আসন্ন ? কেউ ভালো নেই ? আশ্চর্য তো !

ফ্যান্ডি কাপ সরিয়ে রেখে বলে ওঠে : আসলে ওর নিজের বোন ছিলো প্রফেশন্যাল কিলার । এখানেই ছিলো । সাজা কেটে ফিরে যায় দেশে । ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেয়নি ওকে । সৌভাগ্য বশতঃ ও যেই তিনজনকে মারার কাজ করেছে কেউই মারা যাননি । খুব জখম হয়েছেন কেবল । তাই ওকে বেশি সাজা পেতে হয়নি ।

ওরা জানতো না । পরে জেনেছে , ধরা পড়ার পরে । সেই বোন কোনো বাজে সঙ্গে পড়ে এইসব শুরু করে ।

স্কুল থেকেই উল্টোপথে যায় । পরে গীতা ওকে এখানে নিয়ে আসে । গীতার দাদু ছিলেন জমিদার বাড়ির নায়েব । তাই বন্দুক চালাতে জানতেন । সেই বন্দুকের সাথে ওর বোন রিটা খুব কম বয়স থেকেই খেলতো । গানস্ আর নাইভস- ছিলো ওর সাথী , বরাবরের । পরে ঐ সুত্র ধরেই বেপথে যাওয়া ।

এখানে এসে রিটা বদসঙ্গে পরে । ওর এক বয়ফ্রেন্ড ছিলো যে এইসব কাজে লিপ্ত । খুব ম্যাচো । সেই দেখেই প্রেম হয় । পরে ওরা কোনো গ্যাং এ জড়িয়ে পড়ে ।

রিটা এখন দেশে গিয়ে কলকাতায় হাইকোর্টের কাছে টাইপের কাজ করে । দিনে ৫০০০ টাকা আয় করে । ফুটপাথে বসে টাইপ করে দেয় । কাছেই কোথাও বাস করে সে ।

আগে গ্রেটার সাথে যোগাযোগ ছিলো । ইদানিং নেই । সেই ভয়ে গ্রেটা ওর বাচ্চাদের স্কুলে দেয়নি । কোথায় কোন বদলোকের কুনজরে পড়ে যাবে ওরা । ওরাও ছুরি কাঁচি নিয়ে খেলে তবে ওদের বাবা মা সেগুলি দিয়ে ওদের সোপ-স্যান্ড স্কালপ্ট করতে শেখায় ।

আরেকটি জিনিস ওর মা করেন । লোমিলোমি মাসাজ । হাওয়াই দেশের বিশেষ হিলিং মাসাজ । প্রার্থনা করে , পবিত্র চিত্তে এই মাসাজ করা হয় । দিনে একটি ক্লায়েন্টের মাসাজ করে গ্রেটা ।

হাত , কনুই , পা , হাতের তালু , হাঁটু , এমনকি লাঠি ও পাথর ব্যবহার করে এই মাসাজ দেওয়া হয় । গ্রেটা শিখেছে এক হাওয়াই দেশের মানুষের কাছে । গ্রেটা দিনে একজনকে এই মাসাজ দেয় ।

আর ফ্রিতে ।

বলে : এটা আমার চ্যারিটি তাই অর্থ নিই না আমি ।

এটা আমার ব্যবসা নয় ।
তবে ফ্রি বলে বহু মানুষ আসেন । আমি নিজের ইনটিউশান ব্যবহার করে দেখে নিই সত্যি তার এগুলির প্রয়োজন আছে কিনা । থাকলে তাকে দিই । নাহলে যেসব স্পা তে অর্থের বিনিময়ে দেয় সেখানে পাঠিয়ে দিই ।

গ্রেটা অনেস্ট । নাহলে এই মাসাজের থেকেও বেশ কিছু কামাতে পারতো ।
ক্লো মাংস কাটে । ফ্যান্ডেল ফুলের ব্যবসা করে । রিটা ছিলো প্রফেশন্যাল কিলার ।
প্রতিটি নারীই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে গেছেন বা চলেছেন ।

নারী ধারণ করে আছে মানব জাতি । তাই সে মা ।
প্রফেশন্যাল কিলার রিটা তাই বুঝি কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে বলে :
আমি ইচ্ছে করেই ওদেরকে মারতে পারিনি । জখম অবস্থায় বন্দুক এর নল ঘুরিয়ে নিয়েছি । আমার সন্তানের মুখ মনে পড়ে গেছে ।

ওর সন্তান ছিলো অনাথ আশ্রমে । সরকার ওকে দিয়ে এসেছে ওখানে । মা তো জেলে ছিলো তাই । পরে

এক মুসলিম পরিবার ওকে দত্তক নিয়েছে । কিন্তু রিটার ভয় ,সে ওকে যে কোনোদিন হারাতে পারে । যদি কালের নিয়ম মত ওর পালক পিতা মাতা ওকে জিহাদের জন্যে জিহাদীদের হাতে তুলে দেয় !

যেইসব বাবা মা নিজেদের সন্তানকে শত্রুর মুখে ফেলে দেয় তারা কেমন রক্ষক ? কেমন বাবা মা ?
প্রশ্ন প্রফেশন্যাল কিলারের , নীরব প্রশ্ন । কারণ সরব গলার অধিকার হারিয়েছে ওর বেআইনি কাজের কারণে ।

রাত্রি শিলোত্রি জানতে পারে যে ডূলুং এর সঙ্গে ক্রেগের দোস্তি ছিলো । ওরা দুজনে একটি ডিপ ফ্রেন্ডশিপে ছিলো ।
ক্রেগ ওর এই বান্ধবীর ঢালাও প্রশংসা করাতে রাত্রি বলে ফেলে : এই ডুলুং আমারও বান্ধবী ।
ডূলুং খুব ভালো মেয়ে ।

পর্বতারোহণে গিয়েই ওদের আলাপ । মাল নিয়ে ডূলুং অনেক উঁচুতে । চড়াই উৎরাই বেয়ে উঠতে ক্রেগের নাভিশ্বাস উঠছে ।

■ ক্রেগ , হোয়াই আর ইউ সো লেট ?
ওয়াক ম্যান , ওয়াক ফ্যাস্ট !

ডূলুং এর গলার আওয়াজ এখনও কানে রিনরিন করছে ।
চারিপাশে বরফ । সাদা ধবধবে চরাচর । সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে । অসম্ভব ঠান্ডা সেদিন । আর অল্প বাতাস ।
ডুলুং এর মুখ চোখ ওড়না জাতীয় কাপড়ে বাঁধা ।
মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে বাঙালী শেরপা । পিঠে ক্লায়েন্টের মাল । মালবাহী শেরপা । অনেকদূরে রাত্রিবাস । তাঁবু গেড়ে , গরম জল ফুটিয়ে চা পান করবে তখন । মোটা জুতো পরা ।

চিরটাকাল ইচ্ছে ছিলো গ্লেসিয়ার নিয়ে পড়াশোনা করবে কিন্তু বাবা ও মায়ের কারণে সে আজ অর্ধশিক্ষিত । তবুও বরফ প্রেমে পাগল, বরফ মাতাল মেয়েটি দূরে সরে থাকতে পারেনি ।
বেছে নিয়েছে বরফ ভুমি । শেরপা হয়েই । তাই এত কষ্ট সয় সে ।

এরকমই বললো তো ক্রেগ কে । হিমানী , তুহিনা হয়েই সে খুশি । শহরের লালিমা ও কালিমা থেকে বহু দূরে থাকতে চায় ।

দিন শুরু হয় বরফে , শেষ হয় পর্বত চূড়ায় ।

বরফের পশুরা ওর বন্ধু । সখা । বরফে মজা নদী ওকে গান শোনায় । সাদা বালির ওপরে যাকে বলে কোল্ড ডেসার্ট বসে ও গান করে ।

চমরি গাই ওর সাথে শলা পরামর্শ করে । শোনে আকাশ বাতাস নক্ষত্র পুঞ্জ । একটুও ক্লান্তি নেই ওর ।

শুধু কথা ঝরে যায় । ঘাম না ঝরিয়ে ও শব্দ ঝরায় !

যদিও ওর খুব দু:খ হয় ও জন্মগত ভাবে শেরপা নয় বলে ।

ওর জিন সেরকম স্ট্রং নয় , পাহাড়ে চড়ার জন্যে ।

আর শেরপাগণ অনেক কম বাতাসেও নি:শ্বাস নিতে পারে , ক্লান্ত হয়না । হয়ত ওদের হিমোগ্লোবিন বেশ পরিমানে বেশি , কে জানে !

ওদের পাহাড়ে চড়ার দক্ষতা অসীম । ওরা খুব সাহসীও ।

ডুলুং নাকি একটি ছোট পাহাড়ে চড়া ও ট্রেকিং এর কোম্পানি খুলেছিলো , ক্লাইম্ব উইথ ডুলুং নাম দিয়ে ।

সেখানেও ও সৎ কর্মিদের রেখেছিলো যারা জাতে নেপালি ও দক্ষ ।

এছাড়া রান্নার জন্যে ওরা লোকাল বাজার থেকে সবজি ও মাংস কিনে সেদিনের রান্না সেদিনই করতো । আধুনিক সরঞ্জাম , মেশিনারি , তাঁবু ব্যবহার করা হত । ওরা অভিযান ও ট্রেকিং এর জন্যে মানুষের মঙ্গলার্থে সেফটির দিকে বিশেষ নজর দিতো ।

আগে মানুষ , তারপরে ক্লায়েন্ট । এই ছিলো ওদের স্লোগান।

হিউমান ফার্স্ট, ট্রেকিং নেক্সট ।

ডুলুং ওর কোম্পানির আয়ের বেশ কিছু অংশ দান করতো নানান সংস্থায় , বেশির ভাগই বিকলাঙ্গদের জন্য নির্মিত সংস্থা ।

ওর লজিক হল , আমাদের অতিরিক্ত আছে , যাঁরা তেমন ভাগ্যবান নয় তাদেরকে দিলাম আমাদের কিছু অংশ । ভুবন মধুময় হবে ।

এইভাবেই বিদেশী পাহাড়ে ও কাজ করতো । মালবহন করেছে কারণ গাড়ি সব জায়গায় যায়না ।

হাল্কা মাল নিয়ে চলাফেরা করলেও কোনো কোনো সময় পর্যটক অসুস্থ হয়ে যেতো , উচ্চতার কারণে । তখন ডুলুং দলের পান্ডা হলেও ঐ মাল বহন করতে একটু ইতস্তত বোধ করতো না ।

শৈশব থেকে নিজ পরিবারের হাতে অ্যাবিউজড্ হওয়া মেয়েটির ছিলো একটি সুন্দর সতেজ মন ।
শতদলের মতন টলটল করতো , গহীন দিঘীর কালো জলে ।

ও ছবি আঁকতো । ওর মা ছবি নষ্ট করে দিতেন । ছিঁড়ে দিতেন । বলতেন --এসব আর্টস ফার্টস বোকারা করে ।
ওর খুব দু:খ হত ।
এখন ও পাহাড়ের ছবি প্রাণভরে আঁকে । সময় বড় কম , জীবন খুব ছোট্ট । কাজেই সব কাজ করা হয়ে ওঠে না । তবুও অনেক চরিত্র দেখেছে , বহু নারী যারা অসামান্যা । অসাধারণ মানুষ , চমৎকার সব মনের চেতনা তারা ।
ওর পাড়ার ছেলেরা ওকে প্রপোজ করতো । ও সায় না দিলে ওকে ঢিল মারতো । তখন ওকে কেউ রক্ষা করার ছিলো না । ও নিজ ভূমে পরবাসী । বাবা ও মা ওকে দূর ছাই করতো । আজ ও অনেকের ছত্র ।

--আচ্ছা আমি পরের জন্মে নেপালে জন্মাতে চাই । নাম যদি হয় ডুলুং ছেত্রী ? কেমন হবে ? ধুস্ ! পর পর দুই জন্মে কি আর একই নাম হয় ?

ওর বাবা ও মা বলতেন : বিয়ে দিয়ে দেবো আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না এর সাথে ! মেয়ে একটা , একে পড়ানো মানে পয়সা নষ্ট । এদিকে বাবা ও মা দুজনেই বিজ্ঞানী । ডুলুং এর দিদিমা খুব শক্ত ও ভালোমানুষ নাহলে ওর মা এতটা এগোতে পারতেন না !

ডুলুং ওর ডাইরিতেও লিখেছিলো যে কোনো মানুষ ওর কাজে খুশি হয়ে ওকে কিছু দিতে চাইলে ও বলতো : আমাকে এক আকাশ শান্তি দিতে পারো ? এক রাত মহুয়া ? এক পাহাড় আনন্দ ??

আনন্দই ছিলো না তো ওর জীবনে । হতে চেয়েছিলো গ্লেসিয়ার বিজ্ঞানী । উচ্চশিক্ষিত বাবা ও মা ওকে মাধ্যমিকের সময় বই পর্যন্ত কিনে দেন নি । জামাকাপড় কিছুই ছিলো না । পুজোর সময় আলিপুরদুয়ারে ওর রাঙামাসির বাড়ি যায় । সেখানে ওর দুই কাজিন কতনা সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরেছিলো । ডুলুং পুজোতে কোনো পোশাক পায়নি ।

ওর মাসি দুইমেয়েকে বলেন : ওকে দেখে শেখ তোরা । দেখ তো ওকে কিছুই কিনে দেন নি ওর বাবা মা । তবুও ১০ বছরের মেয়েটা হাসিমুখে এঘর থেকে ঐ ঘরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে !

ঠাকুর দেখতে যাবার সময় ওর এক কাজিন ওকে নিজের নতুন জামা ও জুতো দেয় ।

নানান দু:খে প্লাবিত ওর জীবন । এখন ও পাহাড়ে থাকে । পাহাড় ও হিমল মানুষ ওকে শান্তি দেয় । হিমবাহ দেখেই সার্থক নয়ন । নাই বা জানা হল শৈল শিখরের ইতিবৃত্তি ।

--- মানুষের লোভের কি শেষ আছে ? তাই তো ইচ্ছে করে পরজন্মে হিমবাহের কোলেই বড় হই । শহর আমাকে ক্লান্ত করে। মুখোশধারি মানুষ আর জটিলতায় আমি আহত ।

ডুলুং এর ডাইরির লাইন । ভাষা । কথা । কথা আরো কথা ।

শেষদিকে ও পাহাড়ের ঘন কোলে শুধু বরফের মাঝে থাকতো । একটি বাড়ি , পরিত্যক্ত , কাঠের বাড়ি । সেখানে ও ছিলো ।

শীতকালেও ওখানেই থাকতো ।

অনেক পর্যটক ওকে সমতলে , উষ্ণতায় চলে যেতে অনুরোধ করেছেন কিন্তু সে যায়নি ।

তার ভুবন ছিলো বরফ । হিমবাহ । শেরপা জীবন ।

কোম্পানি ছিলো শহরে । সমতলে । ওখানে মাঝে মাঝে যেতো । বিদেশ বলে উন্নত পথঘাট । যোগাযোগ ব্যবস্থা । মোবাইল ।

শীতে, নিদারুণ শীতে ও পাহাড়িয়া ভূমে ছিলো । প্রচন্ড তুষারপাত হয় সেইবার । গত ১২৫ বছরের এরকম ঝঞ্ঝা ও বরফ কেউ দেখেন নি । সমতলেও বরফ পড়েছিলো সেইবার । অসম্ভব ঠান্ডায় ডুলুং এর দুই হাত খসে যায় । হাতের তালু এমনভাবে জখম হয় যে কেটে বাদ দিতে হয় । তবুও ও পাকাপাকি ভাবে নিচে নামেনি । ও বরফ মাতাল । হিমগন্ধা ওর আরেক নাম - তাই লিখেছে :

বরফকে ছেড়ে কোথায় যাবো ?

আমাকে কেউ কোনোদিন ভালোবাসেনি । চায়নি । কিন্তু হিমশীতল বরফ আমাকে মুঠো মুঠো উষ্ণতা দিয়েছে । ভালোবেসেছে ।

ওকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না ।

--- ওয়াং , ওয়াং , হোয়ার আর ইউ ? ডুলুং এর গলার স্বর ভেসে আসে বরফ কাঁপিয়ে ।

আজ কদিন ধরেই ওয়াংকে খুঁজছে । ওয়াং চীনা ছেলে । ওদের পোর্টার । পাহাড়ি পথে হন্টন করে । ছেলেবেলা থেকে হেঁটেই সব জায়গায় যায় । কিছু কিছু পাহাড়ি চরাইতে ডুলুং ওর অভিযাত্রীদের সাইকেল দিতো । ওয়াং কিন্তু ওখানেও হেঁটে যেতো ।

ওকেই ডাকছে --ওয়াং , ওয়াং ? তুমি কোথায় ?

ওয়াং এর স্ত্রী কেলি । কেলি ওদের দলের রাঁধুনি ছিলো । কেলি লিয়ং । কেলির হাতের স্যান্ড উইচ দূর্দান্ত । আরো অনেক মানুষ ছিলো ওদের দলে । যাদের হৃদয়ে আজও ধ্বনিত হয় মানবতা , শ্রদ্ধা , কোমলতা শব্দগুলি ।

স্নোয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করা মেয়েটি ধীরে ধীরে একটি কোম্পানি খোলে । আকারে ছোট যদিও । ওর ভালোবাসার ধন । সেখানে ও বরফ ব্যবসায় নিযুক্ত ।
মাইলের পর মাইল হেঁটেছে ক্লায়েন্টকে নিয়ে । কষ্ট হত কিন্তু সমস্ত কষ্টকে ছাপিয়ে ছিলো ভালোলাগা । তুষারের হাতছানি । শীতল আবহাওয়া । হিমবাহ । তুষারকণা , তুষারের দ্যুতি ।

একটি জায়গায় ও বর্ণনা করেছে , জমা বরফের ওপরে সূর্যের কিরণ পড়ে কত অপরূপ লাগছে । অপার্থিব শোভা । নানান রং ও আকার ধারণ করেছে সেই প্রথম- নির্মল আলো ।

শ্বেত শুভ্র বরফের ওপরে মূয়খমালির সাতরঙা বিচ্ছুরণ --- না দেখলে বোঝা যায়না , দেখলে ভোলা যায়না ।

এতকিছু সত্ত্বেও তার মনে হত : জীবনে কিছুই হয়নি করা ।
ওর বাবা মা এত কৃতি । ও কেউ না , কিছু না ।
মানব জন্ম বুঝি বৃথা গেলো । কোনো পদচিহ্ন আর রাখা হলনা এই দুনিয়ায় ।
ও যখন এখানে নেই , কেউ কি আর ওকে মনে করবে ?

মানব জমিনে সোনা আবাদ করা গেলোনা । বড়ই দূর্ভাগা ও ।
পাহাড়ের শিখরে চড়েছে কিন্তু জীবনের শিখরে চড়তে পারেনি ।

অবসাদে ভুগতো । ক্লিনিক্যাল নয় , মনের শ্লথ গতি ।

অনেক জায়গায় এই নিয়ে লিখেছে , ডাইরিতে ।
রাত্রি শিলোত্রি পড়েছে । রাত্রে শিল পড়েছে , সত্যি , শিলও ।

শিলাবৃষ্টি । স্নো ফ্রস্ট মিস্ট ।
ডুলুং তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে নিহত । বেশ কিছুদিন পরে খবর না পেয়ে রেস্কিউ টিম আসে ও ওকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয় শহরে , হাসপাতালে ।

ও কোমায় ছিলো । কয়েক সপ্তাহ যমে মানুষের টানাটানি হয় ।

কিন্তু জীবন দীপ নিভে যায় ।

অক্সিজেন নিয়ে ওরা পাহাড়ে চড়তো । কিন্তু শেষসময়ে ওর কাছে কোনো অক্সিজেন মাস্ক বা যন্ত্র ছিলো না । হিমে ও জমে যায় । চোখে মুখে বরফ কুচি ।
চারপাশ নি:স্তব্ধ । হয়ত বা কোনো হিমে রাজ্যের পশু এসেছিলো ওকে শুঁকে দেখতে , ওর নিথর দেহটি । পশুত্ব ভুলে , ওকে বাঁচাবার জন্যে গরম ফারের পরশ দিয়েছিলো ওকে । কে জানে ?
হিমের নিচে সব চাপা পড়ে গেছে , তুহিন গল্প ।
এই গল্প কেউ আর কোনোদিন বলবে না !

ডুলুং রয় মারা যাবার বেশ কিছু কাল পরে একদিন সকালে রাত্রি প্রাত:ভ্রমণে যায় । দুলকি চালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন বহু মানুষ । লেকের পাড়ে বড় বড় গাছ । বেঞ্চি ।

লেকের জলে রাজহাঁস । বলিহাঁস হয়ত বা কিছু । অনেক মানুষ হন হন করে চলেছেন । কেউ বিশেষ চেয়ারে করে চলমান । কিছু সারমেয় । সি গাল পাখির বাসা । কলতান । ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাওয়া নিরুদ্দেশে ।

সেইসময় একটু ক্লান্ত বোধ করায় ও একটি কাফেতে ঢুকে কফি পান করে ।

টিভি চলছিলো , নিয়ম মত ।

ও স্পষ্ট শুনতে পায় :

ডেলিয়া দেশের একটি পর্বত শৃঙ্গের নাম দেওয়া হয়েছে ডুলুং রয় । ওদের দেশের মহিলা শেরপা যিনি একটি অপূর্ব কোম্পানি চালতেন তুষার ঝড়ে নিহত হন ।

উনি বরফেই থাকতেন । বরফ ছিলো ওঁর ভুবন । দিনে ১৪ ঘন্টা ট্রেক করেছেন । ১০ মাইল হিমবাহে হেঁটেছেন । দক্ষ ট্রেকার ছিলেন । মমতাময়ীও । জনপ্রিয় ।

পর পর ১২ টি শৃঙ্গ আছে । ওরা সব কটিকে একই নামে ডাকতেন ।

এবার থেকে সবচেয়ে উঁচু চূড়াকে ডূলুং রয় পিক বলা হবে । সংক্ষেপে ডূর-।

কফির পেয়ালা হাওয়ায় ভাসিয়ে দুই হাত শুন্যে তুলে নেচে ওঠে রাত্রি শিলোত্রি ।

ইয়া হু ! চাহে কোয়ি মুঝে জংলী কাঁহে !

আশেপাশের লোক দেখছে ওকে অবাক নেত্রে ।

ওর তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই । ও আজ স্বর্ণখনি পেয়েছে । জোরে জোরে চীৎকার করছে :

গুড থিংস অলওয়েজ কাম টু গুড পিওপেল ।

কিন্তু একটু দু:খ , বিষাদকণা মিশে আছে ওর আনন্দ উৎসবে । কারণ নামটি শুনে কেউ বুঝবে না যে ডুলুং বাঙালী ।

নামটি ইন্ডিজেনাস মানুষের নামের মতন আর পদবীটি তো সাহেবদের মতন । রয় নাম তো ওদের হয়ই ।

এক ঝলকে এক বাঙালী মেয়ের কীর্তি বলে মনে হবেনা মোটেই ।

এই যা দু:খ রয়ে গেলো রাত্রির । ওর মৃতা বান্ধবী অমরত্বের টিকা পড়েছে । যা ওর স্বপ্ন ছিলো । রাজতিলক---ঈশ্বর ওকে আজ সব দিয়েছেন , রাত্রি থেকে ও আলোয় এসেছে । সুখের ফোয়ারার ভরে উঠেছে ওর মৃত জীবন ।

মরণোত্তর শিখা , শিখি পাখা , শিখরে চড়া । শিখর হওয়া শিকর ছেড়ে ।

মানুষ আর কিইবা চাইতে পারে ?

সুজাত , পরিণত , অভিজাত মানুষ ? যারা সভ্যতায় বাঁচে , রুচিশীল হতে চায় ?

রাত্রি শিলোত্রি আজ তাই খুব খুশি । বান্ধবীকে হারানোর ব্যাথা , ডাইরির পাতা থেকে চুঁইয়ে পড়া বেদনা আর মনে দানা বাঁধেনি ।

দুহাত তুলে নাচতে নাচতে তাই ও ছুটে বেড়িয়েছে সারা এলাকা ।

আর খেয়ালি নৃত্য শেষে পথচারী সমস্ত মানুষকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে ওর গোঠে ।

অমৃত পরিবেশনে । কোনো এক শুভ সন্ধ্যায় - অমৃতের ভাগ বাটোয়ারা হবে ।

গরল ছেঁচে অমৃত দেবে দেবকন্যা , অমৃতলোক থেকে । এসো তোমরা সবাই ।

মোমের মানুষ , মাটির মানুষ আর মৃতরাও ।

আনন্দ বার্তা ভাসিয়ে দিলো রাত্রি শিলোত্রি এক অদেখা , অচেনা পার্টির আশায় ।

সেই পার্টির থিম , **সৃষ্টিতে থেকো ধ্বংসে নয় ।**

জীবনের অর্থ গড়া , ভাঙা নয় । মানুষ চলে গেলেও কীর্তি রয়ে যায় ।

আর প্রকৃতি কারো কাছে ঋণী থাকেন না । সবার পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দেন ।

বাঙালি একটি মেয়ের সাহস ও বরফ প্রেমকে স্বাগত জানিয়েছে বিদেশীরা ।

তাকে সম্মানিত করেছে । এই পাওনা কি দেশে বাসীর কাছে কম ???

রাত্রি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর মানস চক্ষে , একটি ছায়াশরীর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে ডুর পিকের ওপরে । ছায়ামানুষ খুব লম্বা ।

ধারালো অবয়ব । তুলতুলে পদচারণা । যেন সে খুবই খুশি ।

বহুদূরে বসে ক্রেগও কি এই একই ছায়ামানুষকে দেখছে ?

কে জানে !

ছায়া দুলে দুলে উঠছে। নির্জনতাও আজ বড় বাঙময়। তারারা স্নিগ্ধ ও শান্ত।

শান্ত বনভূমি।

শুধু রাত্রি শিলোত্রির মনটা দুলে দুলে ওঠে অপার্থিব আনন্দের রঙীন ছায়াতে, আলোতে। আলোতে ছায়াতে ----

সেই ছায়ায় আছে মন, ভালোবাসা, কামনা আর আশা।

আলোতে আছে শুধু গন্ধ, হিমগন্ধ -------

ডূলুং সবসময় বলতো যে ও বরফ ছেড়ে কোথাও যাবে না। বরফ প্রান্তরই এত সুন্দর যে ওর একে একটি কবিতা মনে হয়। বিমূর্ত কবিতা।

যাঁরা স্বপ্ন দেখে তারাই জয়ী হয় । সব যুগে সবখানে সব আলোতে ।

পৃথিবী , চাঁদে , মঙ্গলে অথবা অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে ।

নিয়ম একই । স্বপ্ন দেখো, দেখে যাও । একদিন সফল হবেই ।

একদিন সাফল্য খুঁজে নেবে তোমায় !

THE END